৬

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির দিন থেকেই মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচিত হয়েছে। ভাষার ঐক্যের মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব তা পাকিস্তানি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শোষণের মাধ্যমে আরো দৃঢ়তা লাভ করে। তবে মুক্তিযুদ্ধের তাৎক্ষণিক পটভূমি সৃষ্টিতে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও আইয়ুব খানের পতন ভূমিকা রাখে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় অপর সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তার আমলে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের রায় অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে গণতন্ত্র বিকাশ সম্ভব ছিল। কিন্তু বিজয়ী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে আবার শুরু হয় ষড়যন্ত্র। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বার বার স্থগিত ঘোষণা, হুমকির মাধ্যমে বাঙালির রায়কে উপেক্ষা করা হলে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে তিনি প্রয়োজনে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহ্বান ও স্বাধীনতার ডাক দেন। ফলে একদিকে বাঙালি স্বাধীনতার প্রস্তুতি নিতে থাকে, অন্যদিকে তা দমনে পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সমাবেশ ঘটাতে থাকে। পাশাপাশি শেখ মুজিবের সাথে জেনারেল ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর আলোচনার মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলতে থাকে। ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু করার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ইয়াহিয়া ঐদিন ঢাকা ত্যাগ করেন। ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নির্মম ও বর্বর এই গণহত্যার মাধ্যমেই পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিদায়ের সূচনা হয়, শুরু হয় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যা ২৬ মার্চ এম. এ. হান্নান ও ২৭ মার্চ মেজর জিয়ার চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। শুরু হয় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিরোধ যুদ্ধ। যা ন'মাসের সফল যুদ্ধের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করে।

এ ইউনিট পড়ে আপনি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, আইয়ুব খানের পতন ও ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন জারি, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও আওয়ামী লীগের বিজয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং স্বাধীনতার ঘোষণা বর্ণনা করতে পারবেন।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
- পাঠ-২. আইয়ুব খানের পতন ও ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন জারি
- পাঠ-৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচন
- পাঠ-৪. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ মার্চ
- পাঠ-৫. ২৫ মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা
- পাঠ-৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, ১৯৭১

পাঠ-১

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করতে পারবেন;*
- *গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।*

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঊনসত্তরে জনগণের আন্দোলন যে কেবল ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল তাই–ই নয়, এর মাধ্যমে আইয়ুব খানের শাসনামলে সাধিত 'উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি'র যথার্থ রূপটিও পৃথিবীর সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে যে প্রাথমিক ঘটনাবলির সূত্রপাত তা পরবর্তীকালে কেবলমাত্র ছাত্র সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিক-কৃষক ও ব্যাপক সাধারণ মানুষের মধ্যে। একটি সাধারণ দাবি- আইয়ুবের পতনকে কেন্দ্র করে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের দু'অংশের মানুষ এ সময়ে একযোগে পথে নামে। এ অভ্যুত্থানের পরিণতিতে শুধু আইয়ুব খানেরই পতন ঘটেনি বরং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট সূচিত হয় দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা থেকেই। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার স্বায়ত্তশাসন ইস্যুতে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে থাকে। স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে ১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলা থেকে সংগঠিত দাবি প্রথম উচ্চারিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতিদানের দাবি উত্থাপন করে। তবে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তদানীন্তন পূর্ববাংলায় আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে ১৯৫০ সালের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষে গঠিত মৌলিক নীতিমালা কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপক্ষে। প্রস্তাবটিতে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয় এবং প্রদেশসমূহকে কার্যকরীভাবে কোন স্বায়ত্তশাসন প্রদান করার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। তাই এ প্রস্তাবের

বিপক্ষে পূর্ববাংলায় গড়ে ওঠে মৌলিক নীতিমালা কমিটি বিরোধী আন্দোলন। ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার কমিটির সুপারিশমালার ওপর গণপরিষদের আলোচনা স্থগিত রাখে।

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালিদের দ্বিতীয় প্রতিবাদী ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে। পাকিস্তান সরকার বাঙালির ভাষার ওপর আঘাত হানতে শুরু করে ১৯৪৮ সাল থেকে। এ সময় থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা মূলত বাংলা ভাষার প্রতি প্রকাশ্য হামলা। তখন থেকে পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় উন্নীত করার দাবিতে পূর্ববাংলায় সরকার বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন প্রকটরূপ লাভ করে। ছাত্র সমাজ গঠন করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং এ পরিষদের উদ্যোগে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সমাজ সরকারের দেয়া ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত ও বহু ছাত্র আহত হয়। এর প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং পাকিস্তান সরকার প্রথমবারের মতো বাঙালিদের কঠোর আন্দোলনের মুখোমুখি হয়। অবশ্য এ আন্দোলনে শেষপর্যন্ত বাঙালিদেরই বিজয় সূচিত হয় এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। অপরদিকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ববাংলায় পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার তথা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় এবং মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করে। যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৫ সালের ৩ এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই ৩০ মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করে পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন চালু করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হলেও নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ও যুক্তফ্রন্টের বিজয় বাঙালিদের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধি করে এবং পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান করে।

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় ১৯৫৬ সালে। বিভিন্ন দিক থেকে এ সংবিধান গুরুত্বপূর্ণ হলেও এতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। কিন্তু '৫৬ পরবর্তীকালে পূর্ববাংলায় দলবদলের প্রেক্ষাপটে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে কোন জোরালো আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। উপরন্তু, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তিন বছর পর গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিন বছর পরও আইয়ুবের স্বৈরাচারী মনোভাব তথা নির্যাতন ও গ্রেফতারী নীতি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল ও সর্বসাধারণকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এমনি মুহূর্তে ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি করাচিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। এ সংবাদ পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এটাই আইয়ুবের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের পথ ধরেই '৬০-এর দশকে আইয়ুব বিরোধী ঘটনাবহুল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সামরিক আইনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং সরকারের কতিপয় আমলা ছাত্রদের হাতে নাজেহাল হন। এভাবেই শুরু হল বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন।

১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব খান পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান ঘোষণা করেন। সংবিধানে পুর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের বিষয়টি দারুনভাবে উপেক্ষিত এবং দেশে কঠোর একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাই এ সংবিধানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন করে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ইতোপূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান সহ কতিপয় নেতাকে গ্রেফতার করা হলে সেটাও আন্দোলনের ইস্যুতে যুক্ত হয়। তাই নতুন সংবিধান বাতিল, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব সহ গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। এদিন পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৪ মার্চ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। অবশেষে ব্যাপক আন্দোলন ও প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে ৮ জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন।

আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে কেন্দ্র করে। আগস্ট মাসে এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ছাত্ররা নতুন করে আন্দোলনের ডাক দেয়। কেননা এ কমিশনে পূর্ববাংলার স্কুল, কলেজ শিক্ষাকে সংকুচিত করা হয়েছিল। ঢাকা কলেজ থেকে শুরু করে আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা ধর্মঘট আহ্বান করে এবং ১৭ সেপ্টেম্বর ছাত্ররা দেশব্যাপী হরতাল ডাকে। এদিন ছাত্রদের সাথে উৎসাহ নিয়ে যোগ দেয় দেশের সাধারণ মানুষ। এ দিনের আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে তিন জন নিহত সহ দু'শতাধিক আহত হয়। উত্তেজিত ছাত্ররা আইয়ুবের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয় এবং তার কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে মুক্তি এবং দলীয় কার্যক্রমের কিছুটা সুযোগ দেওয়া হলে পুনরায় রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু হয়। ১৯৬২ সালে ফজলুল হক এবং '৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করলে মূলত রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আবির্ভুত হন শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ সভাপতি) এবং মাওলানা ভাসানী (ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ সভাপতি)। ইতোমধ্যে শেখ মুজিব নেতৃত্ব গ্রহণ করে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী ভিত্তিতে দাঁড় করান। ১৯৬৪ সালে 'ভোটাধিকার কমিশনের' রিপোর্টকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন আবার জোরদার হতে থাকে। কমিশন অন্যান্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কথা সুপারিশ করলেও পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরোক্ষ নির্বাচনের সুপারিশ করলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে।

১৯৬৪ সালের ১১ মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে 'সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। এ কমিটি প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি নিয়ে ১৯ মার্চ হরতাল আহ্বান করে। এ দিন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য শহরে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। '৬৪ সালে এক উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটে ১৬ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। এ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো থেকে কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করলে সেখানে উত্তেজনা দেখা দেয়। ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে গভর্নর মোনায়েম খান বাধার সম্মুখীন হন। এদিন পুলিশ ছাত্রদের ওপর হামলা চালিয়ে কয়েকশত ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করলে পরের কয়েক দিনে সারা প্রদেশে ১৪ শত স্কুল ও ৭৪টি কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ১২শত ছাত্র গ্রেফতার হয়। ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাও গ্রেফতার হন। ২৯ মার্চ সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করে। ১৯৬৪ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। ২৯ আগস্ট ঢাকায় ছাত্রদের ওপর পুলিশী নির্যাতন ও ছাত্র নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতারা মিলিতভাবে ২২ দফা দাবিনামা রচনা করে। দাবিগুলো ছাত্র-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট

হলেও এতে স্বৈরাচারের অবসান, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, রাজবন্দীদের মুক্তি প্রভৃতি রাজনৈতিক ইস্যুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বস্তুতপক্ষে, এ সময় থেকেই ছাত্রদের স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা হয়। ২২ দফা দাবি নিয়ে ছাত্ররা ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালন করে এবং এ দিন থেকে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। সরকার পরদিনই পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্কুল-কলেজ ও ১৯ তারিখে ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। ছাত্র আন্দোলনের সংবাদ ছাপানোর ব্যাপারে পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এতকিছু করেও সরকার আন্দোলন দমাতে পারেনি। ক্রমে ছাত্র আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে একত্রীভূত হয়ে বিশাল রূপ ধারণ করে।

১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতায় পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের বৈষম্যের চিত্র অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেন এবং আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের কঠোর সমালোচনা করতে থাকেন যা পূর্ববাংলার জনসাধারণকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এ সময় ১৯৬৬ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে বাংলার প্রতি অবহেলার চিত্রটি পূর্ববাংলার জনগণকে হতাশ করে এবং তাদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি জোরালো হয়ে ওঠে। যুদ্ধ শেষে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে এক কনফারেন্সে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার সম্বলিত ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু চরম বিরোধের মুখে ছয়দফা দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল–

১. লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক ফেডারেল সরকার গঠন ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

২. দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে আঞ্চলিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদান।

৩. পাকিস্তানের দু'অঞ্চলে পৃথক মুদ্রা চালু অথবা বিশেষ সাপেক্ষে একই মুদ্রা বহাল।

৪. কর ধার্য ও আদায়ে আঞ্চলিক সরকারকে ক্ষমতা প্রদান।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অঞ্চলকে স্বাধীনতা প্রদান।

৬. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের অনুমতি প্রদান।

পাকিস্তানের সরকারি মহল ও পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামপন্থী এবং বামপন্থী নেতৃবৃন্দ ছয় দফাকে পাকিস্তানের ভাঙ্গন তথা বিচ্ছিন্নতার দলিল বলে আখ্যা দিলেও পূর্ববাংলার জনগণ ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলে। আইয়ুব খান আন্দোলন দমানোর লক্ষে ৮ মে '৬৬ শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করলে প্রতিবাদে ৭ জুন দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করা হয়। এ দিন হিংসাত্মক আন্দোলনে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে ১১ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয় এবং শত শত আহত হয়। এতেও সরকার ক্ষান্ত হয়নি। ১৬ জুন বাঙালির মুখপত্র সংবাদপত্র ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হয় এবং ইত্তেফাকসহ কতিপয় পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। সরকারের এরূপ নির্যাতনের প্রতিবাদে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় সদস্যরা ওয়াক আউট করে এবং ছাত্র-জনতা দুর্বার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এভাবে '৬৬ সালের পরবর্তী আন্দোলন ছয় দফাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় এবং ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি শেষপর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ লাভ করে।

ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সরকার বিরোধী আন্দোলন যখন জোরদার হচ্ছিল, তখন সরকার বাঙালিদের স্বাধিকার নস্যাৎ করার লক্ষে এক কূটকৌশল আবিষ্কার করে। সরকার ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক নেতার বিরুদ্ধে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" নামক এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেখানো হয় এরা ভারতের সক্রিয় সহযোগিতায় অর্থ ও অস্ত্র নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষে ভারতের আগরতলায় আগের বছর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অভিযোগের পক্ষে কতগুলো মিথ্যা দলিলপত্র দায়ের করা হয়। গ্রেফতারের পর তাঁদেরকে বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বিচার শুরু হয় এবং '৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নিষ্ফলভাবে মামলা বাতিল ঘোষিত হয়।

আগরতলা মামলা দায়ের এবং আসামীদের গ্রেফতার ও বিচারের শুনানী পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হলে পূর্ববাংলায় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। মামলার প্রতিবাদে ১৯৬৮ সালের ১লা ডিসেম্বর প্রতিবাদ দিবস এবং ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। এ সময় একটা সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে যা পূর্ববাংলার বিপ্লবী জনতাকে উৎসাহ যুগিয়েছিল। ১৯৬৮ সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ১৯৬৯ সালের শুরুতে গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে এবং এ গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়েই আইয়ুব খানের পতন ঘটে।

গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন পর্যায়

১৯৬৮ সালের শেষপর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে এবং '৬৯ সালের শুরু থেকে আইয়ুব খানের পদত্যাগ পর্যন্ত গণআন্দোলন ব্যাপক রূপধারণ করে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এসময়কার পাকিস্তানের ইতিহাস ছিল ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যময়। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান বলতে এ সময়কেই বুঝানো হয়। এ সময়ের ঘটনাসমূহকে ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা–

প্রথম পর্যায় : ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি

দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি

তৃতীয় পর্যায় : ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ।

প্রথম পর্যায়: ১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ ছিল আগরতলা মামলা দায়ের ও নেতাদের নির্বিচারে গ্রেফতার, ছাত্রদের ওপর পুলিশী নির্যাতন। আর এ অভ্যুত্থানের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ। আইয়ুব খানের হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদকে সভাপতি করে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে এগার দফাভিত্তিক এক দাবিনামা প্রস্তুত করা হয়। এরমধ্যে ছয় দফাকেও সংযুক্ত করা হয়। এর সাথে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দিদের মুক্তিদানসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

খুলে দেওয়া এবং বন্দি ছাত্রদের মুক্তি প্রদান এবং ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত কতগুলো দাবি উত্থাপিত হয়। একই সময়ে ৮ জানুয়ারি তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডাক) নামক মোর্চা গঠন করে এবং ৮ দফা দাবি উত্থাপন করে যাতে ৬ দফা ও ১১ দফার সমর্থন পাওয়া যায়।

এরপর থেকে 'ডাক' ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। 'ডাক'-এর আহ্বানে ১৪ জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ১৭ জানুয়ারি 'ডাক' ও 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' যৌথ উদ্যোগে সারা দেশে দাবি দিবস পালিত হয়। ঐদিন ডাকের মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় মিলিত হয় এবং মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এদিন পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। এদিন ছাত্র আন্দোলন ব্যাপক জঙ্গীরূপ ধারণ করে। পুলিশ ছাত্রদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালায় এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। প্রতিবাদে পরদিন আবার ধর্মঘট ডাকা হয় এবং এদিনও পুলিশ ৮ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে।

দ্বিতীয় পর্যায়: ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি

গণঅভ্যুত্থানের চরম অবস্থা বিরাজ করছিল এ সময়ের মধ্যে। পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদ স্বরূপ ডাক ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২০ জানুয়ারি সারা পূর্ববাংলায় ধর্মঘট আহ্বান করে। এদিন সর্বাত্মক হরতাল পালনকালে একজন পুলিশ অফিসারের গুলিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হয়।

আসাদের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে ঢাকায় অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। সমগ্র ঢাকায় প্রতিবাদের জোয়ার ওঠে। আসাদের হত্যার প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ জানুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল চলাকালে রাজপথে ছাত্র-শ্রমিক-কর্মচারী তথা সর্বস্তরের জনগণের ঢল নামে। ঐদিন পাকিস্তান সরকার দিশেহারা হয়ে মিছিলের ওপর গুলি চালালে সচিবালয়ের নিকট এক কিশোর ছাত্র নিহত ও বহু আহত হয়। এরপর ক্ষিপ্ত জনতা সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ-এর ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। পূর্ববাংলা রাজধানী ঢাকাসহ সাময়িকভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

২৪ জানুয়ারির পর আন্দোলন একদিনও থামেনি। ২৫ জানুয়ারি ঢাকা সহ অন্যান্য স্থানে হরতাল পালিত হয়। এদিন ২ জন নিহত ও বহুলোক আহত হয়। ২৬ জানুয়ারি সান্ধ্য আইন থাকাকালে সেনাবাহিনীর গুলিতে তিনজন নিহত ও বহুলোক আহত হয়। এভাবে ৩১ জানুয়ারি এবং ১, ৬, ৯, ১২ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি হরতাল চলাকালে বহুলোক নিহত ও আহত হয়।

এসময়কার আর একটি উত্তেজনাকর ঘটনা হল ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে আগরতলা মামলার বিচারাধীন আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং অপর আসামী সার্জেন্ট ফজলুল হক আহত হন। 'জহুরুল হকের হত্যার প্রতিবাদে ১৬ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী আন্দোলন' অগ্নিরূপ ধারণ করে। জনতা আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতির বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে। অবস্থা প্রতিকূলে দেখে এদিন ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয় এবং তা ১৭ তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকে। ১৮ ফেব্রুয়ারি

সেনাবাহিনী বিনা কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে এবং কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক গুলিতে আহত হন।

১৮ ফেব্রুয়ারির পর ঘটনার দ্রুত অবনতি ঘটে। অবস্থা উপলব্ধি করে আইয়ুব খান বিরোধী দলীয় নেতাদের নিয়ে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করলে নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঢাকা সহ সমগ্র দেশে জনতা আন্দোলনের অগ্নিমন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আইয়ুব খান উপলব্ধি করলেন যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ব্যতীত অবস্থা অনুকূলে আনা সম্ভব নয়। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে আইয়ুব খান ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হবেন না এবং একই সাথে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দিদের মুক্তির আদেশ ঘোষণা করেন। আইয়ুব খানের ঘোষণা মোতাবেক ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল রাজবন্দি মুক্তিলাভ করে। কারামুক্ত শেখ মুজিবকে ২৩ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী (বর্তমান) উদ্যানে বিশাল গণসংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং ঐদিনই তাঁকে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তৃতীয় পর্যায়: ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ

শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির পর আন্দোলন আবার নতুন মাত্রা লাভ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারির জনসভায় বঙ্গবন্ধু ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং ৬ দফা ও ১১ দফা অর্জনে বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি গোল টেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ও ১১ দফার প্রশ্নে অটল থাকেন। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন পুঞ্জিভূত হতে থাকে এবং তাঁকে অপসারণের লক্ষে সেনাবাহিনীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের সময়ও শেখ মুজিব সহ 'ডাক'-এর নেতৃবৃন্দের বিরূপ মনোভাবের কারণে আইয়ুব খান পদে পদে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে থাকেন। এ সময় পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে আইন- শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। অবশেষে ১০ মার্চের গোল টেবিল বৈঠকে আইয়ুব খান অগত্যা পার্লামেন্টারী পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার প্রশ্নে অটল থাকেন। ফলে 'ডাকে'র সাথে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। ১৫ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান দেশ শাসনে তার অপারগতার কথা ঘোষণা করেন। ২২ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে অপসারণ করে তার পরিবর্তে এম.এন. হুদাকে নিয়োগ করেন। ২২ মার্চের পর পূর্ব পাকিস্তানে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটতে থাকে অবশেষে ২৫ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা ত্যাগ করে জেনারেল ইয়াহিয়ার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে।

গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও জঙ্গী আন্দোলন। এটি শুরু হয়েছিল সরকারি নির্যাতনবিরোধী একটি সাধারণ লড়াই হিসেবে। কিন্তু অচিরেই স্বত:স্ফূর্ত আন্দোলনের রূপ নিয়ে তা ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামে-গঞ্জে। আন্দোলনের চরিত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ব্যাপক গণজাগরণের মধ্যদিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের তাৎপর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রথমত, গণআন্দোলন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গেলেই বলতে হয় ১১ দফার কথা। এ কর্মসূচির ফলে ছাত্র সমাজ স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ ও দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ১১ দফা ও ৬ দফার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশব্যাপী এক প্রচন্ড গণবিপ্লবের সৃষ্টি হয়। এ গণআন্দোলনের গতি-প্রকৃতি লক্ষ করে ক্ষমতাসীন সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং তা প্রতিহত করতে পাক সরকার হত্যা ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে আন্দোলন আরো তীব্র ও জোরালো হতে থাকে এবং সমগ্র দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খান মুজিব সহ সকল রাজবন্দিদের বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করেন। তীব্র আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান শেষপর্যন্ত ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয়ত, এ আন্দোলনের সুফল হিসেবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি মিলে।

তৃতীয়ত, এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে শ্রেণী চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং শ্রেণী সংগ্রামের আংশিক বিকাশ সাধিত হয়।

চতুর্থত, এ আন্দোলনের ফলে সবচেয়ে বড় লাভ হলো স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালিদের যে জাতীয়তাবোধ ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছিল তা পূর্ণতা লাভ করে। এ আন্দোলনের মধ্যদিয়েই বামপন্থীদের বৃহৎ অংশ এবং ডানপন্থী সংগঠনভুক্ত সদস্যদের মধ্যে পূর্ববাংলায় পৃথক রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। ছাত্রলীগের সভায় স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার চেতনা জনপ্রিয়তা লাভ করে, যার ফলে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চমত, ১৯৬৯- এর গণঅভ্যুত্থান জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণার দাবি জানিয়েছিল। '৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ২১ ফেব্রুয়ারিকে ছুটির দিন ঘোষণা করেছিল। কিন্তু '৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পর এ ছুটি বাতিল হয়ে যায়। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্বের মর্যাদা ফিরে পায়।

ষষ্ঠত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয়। বাঙালিদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং বাঙালি জাতির স্বাধিকার অর্জনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সর্বদা অটল এবং প্রতিবাদমুখর। '৬৯-এর গণআন্দোলন শেখ মুজিব সহ আওয়ামী লীগ নেতাদের মুক্তির পথ সুগম করেছিল। মুক্তিলাভের পর শেখ মুজিব বাঙালির স্বার্থ রক্ষায় সদা সজাগ ও সক্রিয় ছিলেন। এরফলে তাঁর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আর '৭০-এর নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে শেখ মুজিব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও আদর্শকে সংযুক্ত করায় বামপন্থীদের সমর্থন লাভ করেন। সর্বোপরি '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে পূর্ববাংলায় যে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে '৭০-এর নির্বাচনে তা পুরোপুরি আওয়ামী লীগের পক্ষে চলে যায়। আর এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকারের নির্যাতন, নিপীড়ন আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করতে উৎসাহী করেছিল। মোটকথা, সরকারের জনবিদ্বেষী নীতি ও শেখ মুজিবুর রহমানের জনমুখী চরিত্র '৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়কে সহজ করেছিল।

সারসংক্ষেপ

১৯৬৯-এর গণআন্দোলন ছিল পূর্ববাংলার ইতিহাসে বিভিন্ন আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটি ভিন্ন চরিত্রের আন্দোলন এবং নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের ২২ বছরের গণআন্দোলনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ আন্দোলনের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং শেষপর্যন্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিল এবং স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এজন্য পূর্ববাংলার ওপর থেকে পশ্চিমা স্বার্থান্বেষী মহলের আধিপত্যের অবসান এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের পেছনে '৬৯-এর গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। লেনিন আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি*, ইউপিএল, ঢাকা ১৯৯৭।

২। মেজবাহ কামাল, 'ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একটি সমীক্ষা', *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা।*

৩। মোহাম্মদ ফরহাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯।

৪। মওদুদ আহমদ (অনুবাদ: জগলুল আলম), *বাংলাদেশ ঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ইউপিএল, ঢাকা ১৯৯২।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়–
(ক) ১৯৫২ সালে (খ) ১৯৫৪ সালে
(গ) ১৯৫৬ সালে (ঘ) ১৯৬২ সালে।

২। আইয়ুব খানের আমলে সংবিধান রচিত হয়–
(ক) ১৯৫৮ সালে (খ) ১৯৬২ সালে
(গ) ১৯৬৪ সালে (ঘ) ১৯৬৮ সালে।

৩। ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি ৮টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত মোর্চার নাম ছিল–
(ক) গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (খ) যুক্তফ্রন্ট
(গ) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (ঘ) সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ)।

৪। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষকের নাম–
(ক) আসাদুজ্জামান (খ) মতিউর
(গ) শামসুজ্জোহা (ঘ) হাবিবুর রহমান।

৫। শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন–

(ক) ১৯ ফেব্রুয়ারি (খ) ২০ ফেব্রুয়ারি
(গ) ২১ ফেব্রুয়ারি (ঘ) ২৩ ফেব্রুয়ারি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম পর্যায় সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২। গণঅভ্যুত্থানের শেষ পর্যায় সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৩। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পেছনে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

২। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের বিকাশ সংক্ষেপে আলোচনাপূর্বক এর গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।

পাঠ-২

আইয়ুব খানের পতন ও ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন জারি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের প্রকৃতি ও কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *পশ্চিম পাকিস্তান আইয়ুবের জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *আইয়ুবের পতনের তাৎক্ষণিক কারণ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বিশ্লেষণ করতে পারবেন;*
- *ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ ও তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।*

পাকিস্তানের ইতিহাসে আইয়ুব খানের পতন ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে ইয়াহিয়া খানের উত্থান এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আইয়ুব খানকে পাকিস্তানের লৌহমানব শাসক বলা হতো। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে এক অখন্ড ও অবিভাজ্য রাষ্ট্রের দাবিদার হলেও দুর্নীতির অনুসারী ছিলেন। আর এ নীতিকে কার্যকর করতে গিয়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতা ও সম্পদ পুঞ্জিভূত করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশকে করেছেন নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চিত। তাঁর এ নীতির বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় গড়ে ওঠে তীব্র আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, আর এর সাথে তাঁর অভ্যন্তরীণ ভুল ও দুর্বলতা মিলে শেষপর্যন্ত তাঁর পতন ঘটায়।

আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের প্রকৃতি ও পতনের কারণ

১. বৈষম্য নীতি: আইয়ুব খান অখন্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেও পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন ও বৈষম্য নীতির প্রবক্তা। পাকিস্তানের রাজধানীসহ সকল প্রশাসনিক হেড অফিস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রশাসনের উচ্চ পদগুলোর একচেটিয়া অধিকারসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। সামরিক ক্ষেত্রেও উচ্চপদসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্য ছিল পশ্চিমা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল খুবই সুস্পষ্ট। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্ড়ানে হওয়ায় সবকিছু সেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। জাতীয় আয়ের সিংহভাগ পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত হলেও উন্নয়ন ব্যয়ের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ হতো। লাভজনক সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক হতো পশ্চিমারা এবং ব্যবসায়িক নীতিগুলো তাদের অনুকূলেই প্রণীত হতো। পশ্চিম পাকিস্তানকে বাজার হিসেবে রাখা হয়েছিল। ফলে দ্রব্যমূল্য পশ্চিমের তুলনায় পূর্বে দ্বিগুণ থাকতো। তাছাড়া রাজধানী ও সকল প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিম পাকিস্তান হওয়ায় দু'অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানে অনেক তফাৎ ছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও একই রকম অবস্থা বিদ্যমান ছিল। আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেই সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি মৌলিক গণতন্ত্রের নামে এক প্রহসন গড়ে তোলেন। ১৯৬২ সালে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সীমিত রাজনৈতিক অধিকার পেলেও রাষ্ট্র পরিচালনায় পূর্ব পাকিস্তানিদের অংশগ্রহণ ছিল না। অবশ্য তাঁর এ সংকোচন নীতি পশ্চিম পাকিস্তানেও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিলো।

শিক্ষাক্ষেত্রেও বৈষম্য বিরাজমান ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে যে হারে শিক্ষার হার ও মান বৃদ্ধি পেয়েছিল পূর্বাঞ্চলে সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি। উপরন্তু এ অঞ্চলের ভাষা ও শিক্ষাকে নস্যাৎ করার জন্য বিভিন্ন হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন জেনারেল আইয়ুব খান।

২. দমন নীতি: আইয়ুব খান স্বৈরাচারী ও কঠোর দমননীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদকে তিনি সহ্য করতে পারেন নি। ক্ষমতায় আরোহন করেই তিনি মৌলিক গণতন্ত্র করে রাজনীতিক নেতৃবৃন্দকে কারাগারে বন্দি করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি মৌলিক গণতন্ত্র চালু করে গ্রাম পর্যায়ে একটি অনুগত শ্রেণী তৈরি করেন এবং এদের দ্বারা দু'বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তাঁর দমননীতির মূল লক্ষ ছিল আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমান। ফলে তাঁর শাসনামলের পুরোটাই শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে কাটাতে হয়েছে। আওয়ামী লীগকে দমিয়ে রাখার জন্য তিনি ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামক মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। তাঁর বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে উঠে তিনি তা কঠোর হস্তে দমন করেছেন। পূর্ববাংলায় গড়ে ওঠা ১৯৬২ সালের শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলন, '৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন এবং '৬৯ সালের গণআন্দোলনকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেছেন। এসব আন্দোলনে সরকারি হিসাবে ১৬৯ জন নিহত হলেও বাস্তবে নিহতের সংখ্যা ছিল বহুগুণ বেশি এবং আহত ও গ্রেফতারের সংখ্যা অগণিত।

আইয়ুব খান তাঁর বিরুদ্ধে মত দানকারী সংবাদ পরিবেশককে সহ্য করতে পারেননি। তাই ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলনের খবর ও সরকারি নির্যাতনের সংবাদ প্রচারের দায়ে ১৯৬৬ সালের ১৫ জুন 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরদিন ইত্তেফাক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া বহু পত্রিকা ও ম্যাগাজিন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করা হয়।

আইয়ুব খান পূর্ববাংলায় শিক্ষাকে সংকুচিত করে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই ১৯৬২ সালের শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠলে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি বাংলাকে উর্দুতে রূপান্তরিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তিনি বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য ১লা বৈশাখ এবং রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর তাঁর দমননীতি ছিল ঘৃণ্য ও হীন ষড়যন্ত্রের পরিচায়ক।

পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা হ্রাস

আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণ ছিল অনেকটা জোরপূর্বক। তিনি মাত্র ২০ দিনের মাথায় ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। এরপর রাজনৈতিক দল ও কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করেন যা পশ্চিম পাকিস্তানেও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে একটি কমিশন গঠন করে ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রণয়ন করেছেন। নিজেকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পরেন এবং অসম্মানজনকভাবে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হন। আবার যুদ্ধ শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে দায়ী করে অপসারণ করেন। তাঁর এসব নীতি পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় এবং ভুট্টো তাঁর পতনের পথ সুগম করে দেন। অপরদিকে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সামরিক কর্মকর্তাগণ চীন ও ইন্দোনেশিয়ার সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আগ্রহী হলেও আইয়ুব খান তাদের মতামতের মূল্যায়ন করেন নি। ফলে সেনাবাহিনীতে তাঁর জনপ্রিয়তা কমে যায়। আইয়ুব খানের আর এক ভুল নীতি ছিল, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের এবং শেষপর্যন্ত নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান। এটা তাঁর ভাবমূর্তিকে অনেকাংশে ক্ষুন্ন করেছেন। আইয়ুব খানের আরো একটা ভুল ছিল, শাসনামলের শেষ দিকে তিনি সামরিক কর্মকর্তা অপেক্ষা বেসামরিক কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় সামরিক কর্মকর্তাগণ ক্ষুব্ধ হন। অপরদিকে তিনি রাজনৈতিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হলেও কোন বিরোধী দল তাতে সাড়া দেয়নি। ফলে তিনি উভয় কূল হারান এবং এতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আইয়ুব খানের পূর্বের ভাবমূর্তি অনেকটা ক্ষুন্ন হয়। এভাবে অভ্যন্তরীণভাবে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে তা ভেঙ্গে পড়ে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও আইয়ুব খানের পতন

১৯৬৯ সালের শুরুর দিকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। এ সময় আন্দোলনের মূল নেতৃত্বদান করে ছাত্র সমাজ। জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মিলে "ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করে। এ পরিষদ ৬ দফাসহ ১১ দফাভিত্তিক এক দাবিনামা প্রণয়ন করে। এ দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দান এবং ৬ দফাভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান করেন। ছাত্র সমাজ জানুয়ারি মাসে এসব দাবি নিয়ে আন্দোলনের ডাক দেয়। আন্দোলনের মধ্যে ২০ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। এর কিছুদিন পরই ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টে কারাগারে আগরতলা মামলার বিচারাধীন আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে

হত্যা করা হয় এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে গুলী করে হত্যা করা হলে আইয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলন এক গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। আইয়ুব খান পরিস্থিতি প্রতিকূলে দেখে ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে সকল বন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি দান করেন। এর মধ্যদিয়ে আইয়ুব খানের পতনের প্রথম ধাপ রচিত হয়।

'৬৯ সালের ১০ মার্চ আইয়ুব খান রাওয়ালপিন্ডিতে এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। ভাসানী ন্যাপ ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি তা প্রত্যাখ্যান করে। আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি দল তাতে অংশগ্রহণ করে। বৈঠকে আইয়ুব খান মাত্র দুটো দাবি- (১) ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং (২) প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন মেনে নিলে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তা প্রত্যাখ্যান করেন।

বৈঠক থেকে ফিরে এসে ২১ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ও ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলনের ডাক দেন। একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে ৪টি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবি জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং উক্ত দাবির সমর্থনে ব্যাপক ছাত্র-শ্রমিক গণআন্দোলন শুরু হয়। ফলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন আর কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ না থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপকতা লাভ করে। এমতাবস্থায় আইয়ুবের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আইয়ুব খান উপায়ান্তর না দেখে ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা অর্পন করে। এভাবে প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়েই আইয়ুব খানের পতন হয়।

ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ ও প্রতিশ্রুতি

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আরোহণ করেন একজন সামরিক জান্তা হিসেবে। তিনি আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সামরিক আইন জারি করেন। কোন কোন মহলের মতে, ইয়াহিয়া খান আইয়ুব খানকে ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। যাইহোক ক্ষমতায় আরোহণের ৮ মাস পর ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে এক জরুরি ঘোষণা দেন যে, যত শীঘ্রই সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি ব্যবহারযোগ্য শাসনতন্ত্র দেয়া এবং যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গণমনকে আলোড়িত করেছে তার একটা সমাধান করা। একই দিন তিনি ১৯৭০ সালের ৫ ও ২২ অক্টোবর যথাক্রমে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করেন। এর সাথে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে চারটি প্রদেশ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের আইনগত কাঠামো ঘোষণা করেন।

ইয়াহিয়া খান ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। ফলে ইতিহাসে ঘটে যায় অন্যরকম ঘটনা। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি যুদ্ধের মাধ্যমে রক্তের বিনিময়ে তাদের সে অধিকার আদায় করেছিল।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে আইয়ুব খানের এক দশকের শাসনকাল বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই লৌহ মানবের পরিণতি হয়েছিল খুব অপমানজনক। তাঁর এরূপ পরিণতির জন্য প্রধানত দায়ী ছিল পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে বৈষম্য ও দমন নীতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অনুসৃত ভুল নীতি। তাছাড়া ব্যক্তিগত অহমিকাবোধও তাঁর ধ্বংস ডেকে এনেছিল। নতুন শাসক ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের ফলে জনমনে আশার সঞ্চার হলেও যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ক্ষমতায় আসেন শেষপর্যন্ত সেগুলো রক্ষা করেন। আর তাই একইভাবে তিনিও বাঙালি জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭–১৯৭১*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।
২। জি.ডব্লিউ চৌধুরী, *অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলো*, ঢাকা, হক কথা প্রকাশনী, ১৯৯১।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে যে সামরিক শাসকের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করেন তাঁর নাম–
(ক) ইস্কান্দার মীর্জা (খ) জেনারেল হামিদ
(গ) জেনারেল টিক্কা খান (ঘ) রাও ফরমান আলী।

২। আইয়ুব খান গণঅভ্যুত্থান ঠেকানোর জন্য ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন–
(ক) ঢাকায় (খ) লাহোরে
(গ) রাওয়ালপিন্ডিতে (ঘ) করাচিতে।

৩। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন ১৯৬৯ সালের–
(ক) ২৪ মার্চ (খ) ২০ ফেব্রুয়ারি
(গ) ২৫ মার্চ (ঘ) ২৭ মার্চ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। আইয়ুব খানের পতনের পেছনে তাঁর বৈষম্যমূলক নীতি কতটুকু ভূমিকা রেখেছিল তা আলোচনা করুন।
২। পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের বর্ণনা দিন।
৩। ইয়াহিয়া খানের প্রতিশ্রুতি ও এর বাস্তবায়নের একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। আইয়ুব খানের পতনের কারণ চিহ্নিত করুন। কি প্রক্রিয়ায় ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন তা বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩

১৯৭০ সালের নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *১৯৭০ সালের নির্বাচনের পটভূমি আলোচনা করতে পারবেন;*
- *নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রণীত আইনগত কাঠামো আদেশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন;*
- *নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি ও প্রচারাভিযান সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *নির্বাচনের ফলাফল নির্ণয় করতে পারবেন;*
- *নির্বাচনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;*
- *নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।*

পাকিস্তান রাষ্ট্রের ২৪ বছরের ইতিহাসে ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একাধিক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করলেও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল লক্ষণীয়। নির্বাচনী ফলাফল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পূর্বাঞ্চলকে একটি পৃথক অঞ্চল হিসেবে প্রমাণ করে। নির্বাচনের ফলাফল ছিল ছয় দফাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় এবং নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে একদিকে পশ্চিমা শাসকবর্গ পূর্ববাংলার ওপর তাদের কর্তৃত্বের বৈধতা হারায়, অপরদিকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত করে।

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পটভূমি

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও প্রস্তাব অনুযায়ী প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেয়াতো দূরের কথা দেশ বিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববাংলাকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে মনে করতে থাকে। দেশ বিভাগের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশের সংবিধান রচনা করার কথা থাকলেও শাসক মহলের অনীহার কারণে ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। নির্বাচনী ফলাফল মুসলিম লীগকে রীতিমত হতাশ করে দেয়। যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে। অল্পদিন পরেই গভর্নর জেনারেল চক্রান্তের মাধ্যমে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন। ফলে প্রদেশগুলোতে পুনরায় গভর্নরের শাসন কার্যকর হয়।

দু'বছর পর ১৯৫৬ সালে র প্রথম সংবিধান রচিত হয়। এতে পূর্ব ইউনিটের স্বায়ত্তশাসনাধিকার স্বীকৃত হলেও কেন্দ্রের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা পুঞ্জিভূত রাখা হয়েছিল। কিন্তু এ সংবিধান পুরোপুরি কার্যকর হতে না হতেই ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সামরিক শাসন জারি

করেন এবং সংবিধান ও সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরপর থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন। আইয়ুব খানের শাসনামলে ১৯৬০ ও '৬২ সালে দু'বার বিরোধী দলবিহীন এবং ১৯৬৪ সালে সর্বদলীয় নির্বাচনের নামে প্রহসন চালানো হয়েছিল। তাঁর স্বৈরশাসন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মৌলিক অধিকার ও পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবি সম্বলিত ছয় দফাভিত্তিক জনপ্রিয়তা ও আন্দোলন দমানোর লক্ষে শেখ মুজিব সহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামক মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করতে থাকে। কিন্তু আইয়ুব খানের এই বৈরী মনোভাবে পূর্ববাংলার জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ১৯৬৮ ও '৬৯ সালে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। শেষপর্যন্ত গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ইতোপূর্বে আগরতলা মামলা প্রত্যাহারসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি প্রদান করেন।

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে পরবর্তী নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়। তবে ১২ নভেম্বর পূর্ববাংলার কিছু অঞ্চলে ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় ঐ সব অঞ্চলে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

খ. আইনগত কাঠামো আদেশ

ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ নির্বাচন সংক্রান্ত আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন। তাঁর ঘোষণায় যেসব বিষয় উলে- খিত হয় সেগুলো হলো–

ক) পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে সাবেক প্রদেশগুলো পুন:প্রতিষ্ঠা করা হবে।

খ) নির্বাচনে এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি গ্রহণ করা হবে। প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবেন।

গ) দু'অংশের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, আইন ও অর্থনীতি বিষয়ক দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্ধারণ করবেন।

ঘ) দু'এলাকার স্বায়ত্তশাসন ততটুকু হবে যাতে জাতীয় অখন্ডতা ও সংহতি বিঘ্নিত না হয়।

ঙ) পাকিস্তানের দু'অংশের নাগরিকবর্গ তাদের এলাকার অর্থনৈতিক সম্পদ ও উন্নয়নের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে, শুধু নিশ্চিত করতে হবে যে কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার যেন সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে।

চ) ভোটার তালিকা ১৯৭০ সালের জুনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে এবং ৫ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনও অব্যবহিত পরে সম্পন্ন হবে।

ছ) সংবিধান রচনার জন্য তিনি পরিষদের প্রথম অধিবেশন থেকে ১২০ দিনের সময় ধার্য করে দেন। এ সময়ের মধ্যে কাজ সমাধান করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ ভেঙ্গে নতুন নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেন।

জ) পরিষদ নিজেরা ঠিক করবে যে তারা কিভাবে ভোট দেবে।

ঝ) একই সাথে বলা হয় সংবিধান রচনা এবং সংবিধানকে সত্যায়িতকরণ পর্যন্ত সামরিক শাসন বহাল থাকবে।

ঞ) প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে, নববর্ষের প্রথম থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হবে এবং এক্ষেত্রে দলগুলোর জন্য কিছু আচরণবিধি দু'দিন পর ঘোষিত হবে।

ট) পশ্চিম পাকিস্তানের পুনরুজ্জীবিত প্রদেশগুলো ১৯৭০ সালের পয়লা জুলাইতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঠ) ১৩ জন মহিলা প্রতিনিধি নিয়ে ৩১৩ আসনের জাতীয় পরিষদ হবে আর ৬২১ জন সদস্য নিয়ে হবে পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ।

পরিষদের আসনসমূহ নিম্নোক্তভাবে বন্টন করা হয়-

অঞ্চল	জাতীয় পরিষদ			প্রাদেশিক পরিষদ		
	সাধারণ	মহিলা	মোট	সাধারণ	মহিলা	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯	৩০০	১০	৩১০
পাঞ্জাব	৮২	৩	৮৫	১৮০	৬	১৮৬
সিন্ধু	২৭	১	২৮	৬০	২	৬২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	১৮	১	১৯	৪০	২	৪২
বেলুচিস্তান	৪	১	৫	২০	১	২১
কেন্দ্র শাসিত এলাকা	৭	-	৭	-	-	-
মোট	**৩০০**	**১৩**	**৩১৩**	**৬০০**	**২১**	**৬২১**

ণ) সাধারণ আসনে নির্বাচন হবে নির্বাচনী এলাকায় প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে, তবে মহিলা আসনে প্রত্যেক প্রদেশের নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা সদস্য নির্বাচন করবেন।

ত) কেন্দ্র শাসিত এলাকায় নির্বাচনবিধি রাষ্ট্রপতি প্রণয়ন করবেন।

থ) সংবিধান বিল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বা অন্যকোন বিশেষ ব্যবস্থায় গৃহীত হবে, তা জাতীয় পরিষদ প্রথমেই স্থির করবে।

দ) সংবিধান গৃহীত হলে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ হবে নতুন সংবিধানের অধীনে প্রথম আইন পরিষদ।

ধ) আইনগত কাঠামো আদেশে ভবিষ্যতের সংবিধান সম্বন্ধে যথেষ্ট দিক নির্দেশনা সন্নিবেশিত হয়। এ আদেশের ২০ ধারায় সংবিধানের মূল ছয়টি নীতি বেঁধে দেয়া হয়। যথা– (১) ফেডারেল পদ্ধতির সরকার, (২) ইসলামী আদর্শ হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি, (৩) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন, (৪) মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, (৫) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করতে হবে, (৬) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

আইনগত কাঠামোর আদেশে সার্বভৌম পার্লামেন্টের বদলে একটি দুর্বল পার্লামেন্টের রূপরেখা দেয়া হয় এবং প্রেসিডেন্ট সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে থেকে যান। পূর্ব পাকিস্তান -এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও একমাত্র ন্যাপ (ভাসানী) গ্রুপ ছাড়া সব দলই নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সর্ববৃহৎ দল আওয়ামী লীগ মনে করে আসন্ন নির্বাচন ব্যালটের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি আদায়ের সর্বশেষ সংগ্রাম।

গ. নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা

১৯৬৯ সালের ২৮ জুলাই ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের একজন বাঙালি বিচারক বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। এ নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক কাজ ছিল একটি সার্বজনীন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা। কমিশন সফলতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেছিল। ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার জন্য সারা দেশব্যাপী স্থাপন করা হয় এক বিরাট কার্যকরী ব্যবস্থা যাতে ছিল ২৮৫ জন রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ১,৪০৪ জন সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার, ১৪,১২১ জন সুপারভাইজার এবং ৪৫,৭৬৬ জন গণনাকারী। নতুন ভোটার তালিকার প্রস্তুতি চলছিল ১৯৬৯ সালের ২৭ আগস্ট হতে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোটার তালিকা প্রস্তুতি শেষ হয়। তালিকাভুক্ত ভোটারের মধ্যে ৩,১২,১৪,৯৩৫ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের এবং ২,৫২,০৬,২৬৩ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। এ ভোটার তালিকায় উপজাতীয় অধিবাসীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নির্বাচনী সীমানা নির্দেশকরণের জন্য বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে চেয়ারম্যান ও পাকিস্তানের দু'অংশের হাইকোর্টের একজন করে বিচারপতি নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিশন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ৫৮টি নির্বাচনী এলাকা এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৯৬টি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ৩৯টি এবং ৪টি প্রাদেশিক পরিষদের ৮৯টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করে। ১৯৭০ সালের ৫ এবং ২৫ জুন যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচনী এলাকারও ভোটার চূড়ান্ত হয়।

ঘ. রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান

ইয়াহিয়া খান কর্তৃক নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হওয়ার পর পর রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নবচেতনা জেগে ওঠে। আওয়ামী লীগপন্থী দলগুলো আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও দলীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এককভাবে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। ফলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো পৃথক পৃথকভাবে প্রার্থী মনোনীত করে। দলগতভাবে প্রার্থী মনোনয়নের তালিকা নিম্নরূপ–

জাতীয় পরিষদের জন্য দলগত প্রার্থীসংখ্যা, পূর্ব পাকিস্তান

দলের নাম		
১. নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	-	১৬২
২. নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামী ইসলাম	-	৪৯
৩. ইসলাম গণতন্ত্রী দল	-	৫
৪. জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তান	-	৭০
৫. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, পশ্চিম পাকিস্তান	-	১৫
৬. জাতীয় গণমুক্তি দল	-	৫

৭. কৃষক-শ্রমিক পার্টি	-	৪
৮. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	-	১৪
৯. পাকিস্তান দরদী সংঘ	-	১
১০. পাকিস্ড়ান পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	-	৭৯
১১. পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	-	৯৩
১২. পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	-	৫০
১৩. পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	-	৬৫
১৪. পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)	-	৩৯
১৫. পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস	-	৪
১৬. পাকিস্তান জাতীয় লীগ	-	১২
১৭. স্বতন্ত্র	-	১১৪
	মোট = ৭৮১	

জাতীয় পরিষদের জন্য দলগত প্রার্থী সংখ্যা, পশ্চিম পাকিস্তান

দলের নাম	**পাঞ্জাব**	**সিন্ধু**	**উ:প:**	**সীমান্ত**	**প্রদেশ**
বেলুচিস্তান					
১. নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	৩	২	২	১	
২. নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামী ইসলাম	৪	-	২	-	
৩. বেলুচিস্তান ইউনাইটেড ফ্রন্ট, সংযুক্ত	১	১	২	-	
৪. জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তান	৪৪	১৯	১৫	২	
৫. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, পশ্চিম পাকিস্তান	৪৭	২১	১৯	৪	
৬. জাতীয় গণমুক্তি দল	-	১	-	-	
৭. থাকসার তেহরিক	২	-	-	-	
৮. মারকাজী জমিয়তে আহলে হাদীস, পাকিস্তান	২	-	-	-	
৯. মারকাজী জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান	৩৬	৮	১	-	
১০. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	২	২	-	১	
১১. পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২১	৩	২	১	
১২. পাকিস্তান মাসিহী লীগ	১	১	১	-	
১৩. পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	২৪	৬	১	১	
১৪. পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৫০	১২	৫	২	
১৫. পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	৩	১২	১৭	৪	
১৬. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)	-	৬	১৬	৩	

১৭. পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি	৭৭	২৫	১৬	১
১৮. সিন্ধু-করাচী মুহাযির পাঞ্জাবী পাঠান মুত্তাহিদা মাহাজ	১	১	-	-
১৯. সিন্ধু সংযুক্ত ফ্রন্ট	-	১	-	-
২০. স্বতন্ত্র	১১৫	৪৫	৪৫	৬
মোট =	**৪৬৩**	**১৭০**	**১৪২**	**২৬**

ঙ. রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি ও প্রচারাভিযান

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ২৪টি দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচন কমিশন দলগুলোর প্রতীক বরাদ্দ করার পরই ২৭ অক্টোবর থেকে নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হয়। আওয়ামী লীগ অবশ্য অনেক আগে থেকে বিভিন্ন জনসভায় নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দেয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে এ প্রথমবারের মত রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় বেতার ও টেলিভিশনে তাদের প্রচারাভিযান চালানোর সুযোগ পায়। ফলে নির্বাচনী প্রচারণা খুব জমজমাট হয়ে ওঠে। নির্বাচনী প্রচারে মূলত আওয়ামী লীগ ও পিপল্‌স পার্টি প্রাধান্য লাভ করে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে ঐতিহাসিক ছয় দফা পক্ষে প্রচারাভিযানে নামেন। তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক গণতন্ত্র এবং আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন- যেগুলো অনেক আগে থেকেই পূর্ববাংলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এছাড়া শেখ মুজিব পূর্ববাংলার ধর্মপ্রিয় মুসলমানদের মন জয় করার জন্য ইসলামি আদর্শের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "ইসলাম হচ্ছে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের গভীরভাবে লালিত বিশ্বাস। আওয়ামী লীগ দৃঢ়তার সাথে নিশ্চয়তা দেয় যে, শাসনতন্ত্রে এটা পরিষ্কারভাবে নিশ্চয়তা থাকবে যে, ইসলামী আদর্শ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে যেমনটা আছে তার বিপরীত কোন আইনই পাকিস্তানে কার্যকর কিংবা চালু করা হবে না।" আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা অধ্যাপিকা বদরুন্নেসা আহমেদ '৭০ সালের ৩ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজকে বাংলাদেশের মাটি থেকে গণবিরোধী শক্তিসমূহকে চিরদিনের মত উৎখাত করার লক্ষে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

পাকিস্তানের অপর বৃহত্তর দল ছিল ভুট্টোর পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি। ভুট্টোর নির্বাচনী শ্লোগান ছিল "ইসলাম হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র হচ্ছে আমাদের নীতি এবং সমাজতন্ত্র হচ্ছে আমাদের অর্থনীতি।" তাঁর দলের ঘোষণাপত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের, পুঁজিবাদের মুলোৎপাটন এবং ইসলামি সমাজতন্ত্রের সূচনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। ভূট্টোর নির্বাচনী প্রচারণার উল্লেখযোগ্য দিক ছিল শেখ মুজিব ও ছয় দফার সমালোচনা। তিনি ছয় দফাকে পাকিস্তানের জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত বলে আখ্যা দেন।

'৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একাই সবগুলো আসনে প্রার্থী দেয়ায় এবং সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জোট গঠন না করায় তাদের রোষানলের শিকার হয়। ফলে ঐসব দল তাদের কর্মসূচি পেশ করার নামে সরাসরি আওয়ামী লীগের সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী) প্রাদেশিক শাখার সভাপতি মোজাফফর আহমদ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 'সংগ্রাম বিমুখতা ও আপোষবাদী ভূমিকা' গ্রহণের অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, আওয়ামী লীগ যে স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র চায় তা যথার্থ নয়। পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রধান খাজা খায়ের উদ্দিন মন্তব্য করেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশ ইসলামি শাসনতন্ত্র থেকে বঞ্চিত হবে। অপরদিকে ধর্মীয় ইস্যু নিয়ে যে সকল দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল তাদের উদ্দেশে পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি প্রধান জেড. এ. ভুট্টো মুলতানের এক

জনসভায় ভাষণ দানকালে বলেন যে, পাকিস্তানে ইসলাম নয়, বরং পুঁজিবাদই বিপন্ন হয়েছে। তিনি আরো বলেন ইসলাম বিপন্ন হওয়ার ধুয়া শুধু নির্বাচনের জন্য জনগণকে বিভ্রান্ত করার মিথ্যা প্রচারণা মাত্র।

এভাবে বিভিন্ন দল বিভিন্ন মতামত নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। বক্তৃতা ও বিবৃতিতে বিভিন্ন দলের যে সার্বজনীন আদর্শ ও লক্ষ পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচারাভিযানের মূল বিষয় ছিল আঞ্চলিকতা বা উদীয়মান বাঙালি জাতীয়তাবাদ। ভুট্টোর মূল বক্তব্য ছিল তাঁর "ইসলামি সমাজতন্ত্র" এবং কাশ্মীর সমস্যার ন্যায় ভারত- পাকিস্তান বিবাদসহ বৈদেশিক নীতির ওপর। ডানপন্থী দলগুলো ইসলামী আদর্শের ওপর এবং বিদেশী 'ইজম' যেমন– সমাজতন্ত্রের বিপদ থেকে দেশ রক্ষার ওপর জোর দেয়। ওয়ালী খানের মৌলিক আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি এবং তাঁর নিজের প্রদেশের আঞ্চলিক সমস্যাদি সমাধান। ভাসানী তাঁর বক্তৃতায় দারিদ্র বিমোচনের কথা বলেন।

নির্বাচনী প্রচারণায় মূল আকর্ষণ ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও ভুট্টো। এ দু'নেতার বাচনভঙ্গি এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতা জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল জনগণের নিকট বেশি আকর্ষণীয়। নির্বাচনী প্রচারণা জমজমাট হয়ে উঠলে ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ববাংলায় জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। এতে এ অঞ্চলের মানুষ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ভাসানী সহ কতিপয় নেতা নির্বাচন পেছানোর দাবি তুললেও শেখ মুজিব নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে অটল ছিলেন। অবশেষে পূর্ববাংলায় ৭ এবং ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, আর বন্যাকবলিত ৯টি আসনে ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

চ. নির্বাচনের ফলাফল

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল

দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	বেলুচিস্তান	কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	মহিলা	মোট (মহিলা আসনে বাদে)
আওয়ামী লীগ	১৬০	-	-	-	-	-	০৭	১৬০
পি.পি.পি.	-	৬৪	১৮	০১	-	-	০৫	৮১
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	-	০১	০১	০৭	-	-	-	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	-	০৭	-	-	-	-	-	৭
জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (হাজারভী)	-	-	-	০৬	০১	-	- ৭	
মারকাজী জমিয়ত উল উলেমা ই ইসলাম	-	-	০৪	০৩	-	-	- ৭	
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)	-	-	-	০৩	০৩	-	০১	৬
জামায়াতে-ই-ইসলামী	-	০১	০২	০১	-	-	-	৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশান)	-	০২	-	-	-	-	-	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	০১	-	-	-	-	-	-	১
স্বতন্ত্র	০১	০৩	০৩	-	-	০৭	-	১৬
মোট =	**১৬২**	**৭৮**	**২৮**	**২১**	**০৪**	**০৭**	**১৩**	**৩০০**

পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদে বিভিন্ন দলের অর্জিত ফলাফল

দলের নাম	মোট আসন	প্রাপ্ত আসন

১. আওয়ামী লীগ	৩০০	২৮৮
২. পি.ডি.পি.	”	২
৩. জমিয়াতে ইসলাম	”	০
৪. উলেমা-ই-ইসলাম	”	১
৫. নেজামী ইসলাম	”	০
৬. জামায়াতে ইসলামী	”	১
৭. ন্যাপ (ওয়ালী)	”	১
৮. স্বতন্ত্র	”	৭

নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে মহিলা ৭টি সহ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আর পিপল্‌স পার্টি মোট ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। তেমনি প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মহিলা আসন সহ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রাদেশিক পরিষদের ফলাফলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিমাঞ্চলে একটি আসনও পায় নি তেমনি পিপিপি পূর্বাঞ্চলে একটি আসনও পায়নি। নির্বাচনী এরূপ ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানকে একটি পৃথক অঞ্চল এবং বাঙালি জাতিকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এই অঞ্চলের ওপর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপকে অবৈধ বলে প্রমাণ করেছে।

ছ. নির্বাচনের গুর ত্ব

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর ১৯৭০ সালের নির্বাচনই ছিল বেশি অবাধ ও নিরপেক্ষ। এজন্য এ নির্বাচনের গুরুত্ব সর্বাধিক। তাছাড়া বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে বিভিন্ন দিক থেকে এ নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১. বাঙালি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয়: ১৯৪৭ সালের পর থেকেই বাঙালি জাতি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদ দাবি করে আসছিল। পশ্চিম পাকিস্তান নানা উপায়ে তাদেরকে দমিয়ে রেখেছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির সে স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় ঘটে।

২. আঞ্চলিক প্রাধান্য: এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও পিপিপি আঞ্চলিক প্রাধান্য লাভ করে। ফলে উভয় দলই এককভাবে কোন অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব করার বৈধতা হারায়। একই সাথে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন অবৈধ বলে প্রমাণিত হয়।

৩. স্বায়ত্তশাসনের দাবির বৈধতা প্রমাণ: বাঙালি জাতি দীর্ঘদিন থেকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছিল। সরকার এ দাবিকে অবৈধ বলে প্রত্যাখান করেছিল। অবশেষে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের রায় বাঙালিদের ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির বৈধতা প্রমাণ করে।

৪. বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ়করণ: ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে পূর্ববাংলায় যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তা আরো সুদৃঢ় হয়।

৫. আওয়ামী লীগের গুরুত্ব বৃদ্ধিঃ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ববাংলায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এ অঞ্চলে আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে এবং পরবর্তী যে কোন জাতীয় প্রশ্নে এ দলের নেতৃত্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৬. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রভাবঃ নির্বাচনের পূর্বে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, নির্বাচনে বিজয়ী দল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠন করবে এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক সংবিধান প্রণয়ন করবে। কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হওয়ায় শুরু হয় ষড়যন্ত্র। ফলে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর এ ঘোষণা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বাঙালি জাতি তা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং তারা এটাও উপলব্ধি করল যে, যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদেরকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে।

ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ববাংলায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ২মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় তৎকালীন ডাকসু সহ-সভাপতি আ.স.ম. রব বাংলাদেশের মানচিত্র অংকিত লাল-সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) বিশাল জনসভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ঘোষণা দেন। এরপর থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিষয়টি স্পষ্ট এবং বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ববাংলা অশান্ত হয়ে উঠলে ১৫ মার্চ তিনি ঢাকা আসেন এবং ২৫ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ব্যর্থ আলোচনা চালিয়ে যান। এরমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার সৈন্য ও অস্ত্র আসতে থাকে। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং বাঙালিদেরকে কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ দিয়ে যান। সে রাতেই নিরীহ বাঙালির ওপর পশ্চিমা বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে এবং রাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পাকিস্তান নিয়ে যায়। গ্রেফতারের পূর্বেই শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়ারলেসযোগে চট্টগ্রাম পাঠিয়ে দেন। চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি ২৬ মার্চ দেশবাসীকে জানিয়ে দেন। ২৭ মার্চ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পুনরায় পাঠ করে দেশবাসীকে জানান। ২৬ মার্চ থেকে পূর্ববাংলায় ব্যাপকভাবে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। অবশেষে ৯ মাসব্যাপী যুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করে। তাই বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ তৈরি করে দিয়েছিল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

জ. নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব সাফল্য লাভের পেছনে কতগুলো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যথা–

প্রথমত, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছয় দফাভিত্তিক দাবি পূর্ববাংলার জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল। বস্তুতপক্ষে এসব দাবি ছিল এ অঞ্চলের আপামর জনসাধারণের প্রাণের দাবি এবং নির্বাচনের

পূর্বেই এসব দাবি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ফলে নির্বাচনে জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে মূলত তাদের দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমাঞ্চলের শাসকবর্গ নানা উপায়ে পূর্বাঞ্চলকে শোষণ করেছে। এ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তাই নির্বাচনে পশ্চিমা দলগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে তারা প্রতিশোধ আদায় করেছে।

তৃতীয়ত, নির্বাচনী প্রচারণায় শেখ মুজিব ইসলামি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে এ অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মানুষের সমর্থন পেয়েছেন।

চতুর্থত, ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের বন্যায় এ অঞ্চলে জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। পাকিস্তানের শাসকবর্গ এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। শেখ মুজিব বন্যার্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও সরকারের ব্যর্থতা প্রচার করে নির্বাচনে সফলতা অর্জন করেছেন।

পঞ্চমত, শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত ইমেজ আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন সবার প্রিয় এবং বক্তা হিসেবে সবার উর্ধ্বে। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন যা নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছিল।

ষষ্ঠত, ভুট্টো এক- ইউনিটের কথা ঘোষণা করে পাঞ্জাবিদের নিকট জনপ্রিয়তা পেলেও পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের নিকট বিরাগভাজন হন।

সপ্তমত, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের প্রতি অনুগত না হয়েও ইসলামি সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করে ভুট্টো পাকিস্তানের ইসলামপন্থীদের সমর্থন পান নি। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল অ-মুসলমান। ফলে তারা ভুট্টোর ইসলামি প্রচারণার বিপরীতে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছিল।

অষ্টমত, ভুট্টো সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে সমাজতন্ত্রের কথা ঘোষণা করে পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের সমর্থন হারান।

নবমত, সর্বোপরি ১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ববাংলায় যে স্বাতন্ত্র্যবাদ ও পৃথক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল '৭০ সালের নির্বাচনে তা আওয়ামী লীগের পক্ষেই কাজ করেছিল। এক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত ইমেজ ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট আওয়ামী লীগের বিজয়কে সহজ করেছিল।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্বাঞ্চলে শাসন করার বৈধতা হারায়। অপরপক্ষে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরো সুদৃঢ় করে। অবশেষে পশ্চিমা শাসকবর্গ আওয়ামী লীগের বিজয়কে অস্বীকার করলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও শেষপর্যন্ত মুক্তি যুদ্ধের সূচনা হয় এবং এ যুদ্ধে শেষপর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয় হয়। তাই বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্যে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।
২। জি.ডব্লিউ. চৌধুরী, *অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি*, ঢাকা, হক কনা প্রকাশনী, ১৯৯১।
৩। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন ১৯৬৯ সালের–
(ক) ২৫ মার্চ (খ) ২৬ মার্চ
(গ) ৩০ মার্চ (ঘ) ৫ এপ্রিল।

২। ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন ধার্য হয় যথাক্রমে–
(ক) ৭ ডিসেম্বর এবং ১৭ ডিসেম্বর (খ) ৫ ডিসেম্বর ও ১০ ডিসেম্বর
(গ) ১৭ ডিসেম্বর ও ২৭ ডিসেম্বর (ঘ) কোনটিই নয়।

৩। ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের প্রাক্কালে যে আদেশ জারি করেন তার নাম–
(ক) এবডো (খ) পোডো
(গ) জননিরাপত্তা আইন (ঘ) আইনগত কাঠামো আদশ।

৪। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে মহিলা আসন নিয়ে মোট আসন সংখ্যা ছিল–
(ক) ৩০০ (খ) ৬২১
(গ) ৩১৩ (ঘ) ৩৫০।

৫। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন–
(ক) হামুদুর রহমান (খ) আবদুস সাত্তার
(গ) এস.এ. রহমান (ঘ) মকসুমুল হাকিম।

৬। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীর সংখ্যা ছিল–
(ক) ৬০০ (খ) ৭৫০
(গ) ৭৮১ (ঘ) ৬৫০।

৭। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ছিল–
(ক) ২৪ (খ) ৩০
(গ) ১৫ (ঘ) ১৪।

৮। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে মহিলা আসনসহ মোট আসন লাভ করে–
(ক) ১৬২টি (খ) ১৬০টি
(গ) ১৬৭টি (ঘ) ১৭০টি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। আইনগত কাঠামো আদেশ সংক্ষেপে লিখুন।
২। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার ওপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৩। এই নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।
৪। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল কিভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে ভূমিকা রেখেছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক প্রণীত আইনগত কাঠামো আদেশ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দিন। নির্বাচনে বিভিন্ন দলের অবস্থান নির্ণয় করুন।

২। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের কর্মসূচি আলোচনা করুন। আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যাসহ এই নির্বাচনের ফলাফল মূল্যায়ন করুন।

পাঠ-৪

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ মার্চ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট/পটভূমি আলোচনা করতে পারবেন;
৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত চলমান অসহযোগ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম পর্ব। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের অযথা গড়িমসি ও প্রতারণা এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর অসহযোগিতা ছিল এ অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কারণ। এ আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল খুবই ব্যাপক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনের সাফল্যজনক পরিণতিতে বাঙালি জাতি যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট/পটভূমি

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি: ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্ড়ানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি (মহিলা ১০টি সহ) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি (মহিলা ৭টি সহ) আসন লাভ করে এবং ভুট্টোর পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তেমনি প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানে ৩১০টি (মহিলা আসনসহ) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়া ন্যায়সঙ্গত হলেও পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করেন। এর সঙ্গে একমত পোষণ করে পিপলস পার্টি।

২. ইয়াহিয়া-ভুট্টো-মুজিব ব্যর্থ আলোচনা: নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানি শাসকচক্রকে হতাশ করে। ইয়াহিয়া চেয়েছিলেন যে কোনভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে এবং ভুট্টো চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগকে দূরে সরিয়ে রেখে যেকোন মূল্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর হতে। অপরদিকে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ক্ষমতার বৈধ দাবিদার। এ তিন নেতার ত্রিমুখী অবস্থান পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঢাকায় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসার কথা ছিল। কিন্তু ভুট্টো চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগকে পাশ কাটিয়ে সরকার গঠন করতে। শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার ভিত্তিতে সরকার গঠনে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি

ঘোষণা করেন পাকিস্তানের কেউ ঢাকায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিলে তার নিজ দায়িত্বে তা করবেন। এর পেছনে তিনি কারণ হিসেবে নতুন সংবিধান প্রণয়ন তাঁর দলের মতামতকে প্রাধান্য প্রদানের দাবি ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানে তার ও নির্বাচিত অপরাপর সদস্যদের ওপর ভারতীয় হামলার অজুহাত দেখান। ফলে পরিস্থিতি অনেকটা রহস্যময় হয়ে ওঠে। এদিকে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ও প্রাদেশিক আইনের খসড়া তৈরির কাজে অগ্রসর হতে থাকে। ১৮ ফেব্রুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো পত্রিকায় এক চাঞ্চল্যকর বক্তব্য প্রকাশ করেন। এতে তিনি ঢাকা এসে আওয়ামী লীগের সাথে আপোষ আলোচনা অবাস্তব ও অসম্ভব ঘোষণা করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো সংকট নিরসনে ৫ দফা 'ফর্মুলা' পেশ করেন। এতে তিনি সকল প্রদেশের জন্য সমান প্রতিনিধিত্বের দাবি তোলেন এবং এজন্যে কেন্দ্রে একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের কথাও বলেন।

ভুট্টোর এসব অসংলগ্ন বক্তৃতা-বিবৃতি পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তাঁরা ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে আহ্বান জানান। এ অবস্থায় ২৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিতে শেখ মুজিবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়। একই দিন ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পেছানো হলে তিনি যোগদান করবেন বলে ঘোষণা দেন। অন্যথায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলনের হুমকি দেন। এসময় ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর হুমকির কাছে নতি স্বীকার করে ১ মার্চ তারিখে হঠাৎ বেতার মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

৩. ছাত্র ও শ্রমিকদের কর্মসূচি: জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ, শ্রমিক, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় জনতা পাক সেনাদের আক্রমণ করে। সংঘর্ষে বহুলোক নিহত ও আহত হয়। ঐদিন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আ.স.ম. আব্দুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন- এ চার নেতা মিলে এক বৈঠকে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। এ ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে পরদিন দেশব্যাপী ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগ ধর্মঘট আহ্বান করে। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক ছাত্র সমাবেশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। সমাবেশে ছাত্রলীগ ৫ দফাভিত্তিক প্রস্ড়াব গ্রহণ করে–

ক. পাকিস্তান ঔপনিবেশবাদী শক্তির সেনাবাহিনীর এ জঘন্য হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে,

খ. স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী আহত বাঙালি ভাইদের বাঁচানোর জন্য স্বাস্থ্যবান বাঙালি ভাইদের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত প্রদান,

গ. পাকিস্তানি ঔপনিবেশবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ,

ঘ. স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং

ঙ. এবং সভা দলমত নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নর-নারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়।

পল্টনে ঐদিন ছাত্রলীগ এক ইশতেহার ঘোষণা করে যা "স্বাধীনতার ইশতেহার" নামে চিহ্নিত হয়। এতে বলা হয়–

১. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে। ৫৪ হাজার ৫শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম "বাংলাদেশ"।

(ক) পৃথিবীর বুকে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা,

(খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করা,

(গ) বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করা।

২. বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে–

(ক) প্রতিটি অঞ্চলে "স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি" গঠন,

(খ) জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা,

(গ) মুক্তিবাহিনী গঠন,

(ঘ) সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং

(ঙ) লুটতরাজ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ পরিহার।

৩. স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা হবে নিম্নরূপ–

(ক) বর্তমান সরকারকে বিদেশী সরকার গণ্য করে এর সকল আইনকে বে-আইনী বিবেচনা,

(খ) অবাঙালি সেনাবাহিনীকে শত্রুসৈন্য হিসেবে গণ্য এবং এদের খতম করা,

(গ) এদের সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা দেয়া বন্ধ,

(ঘ) আক্রমণরত শক্তিকে প্রতিরোধ করতে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ,

(ঙ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টি নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা,

(চ) স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' ব্যবহৃত হবে,

(ছ) পশ্চিম পাকিস্তানি দ্রব্য বর্জন ও সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলা,

(জ) পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকা ব্যবহার,

(ঝ) স্বাধীনতা সংগ্রামরত বীরদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান।

৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক।

পল্টন জনসভায় ৪ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন অর্ধবেলা হরতাল পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। ছাত্র সমাজের ইশতেহারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দেশে শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারি তথা আপামর জনতা সক্রিয়ভাবে হরতাল পালন করে। ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীরা তাদের অনুষ্ঠান বর্জন করে। ছাত্র-শিক্ষক, আইনজীবীগণ তাদের কর্মস্থল ত্যাগ করে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ তিনদিনের

হরতালে ঢাকা সহ সমগ্র দেশে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে বহু লোক আহত ও নিহত হয়। ইয়াহিয়া খান পরিস্থিতিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অগত্যা ৬ মার্চ তারিখে বেতার ভাষণে ঢাকায় ২৫ মার্চ পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণা পূর্ববাংলার বিক্ষুব্ধ মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারে নি। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানও সে ঘোষণায় তৃপ্ত হতে পারেন নি। ফলে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়।

৭ মার্চের ভাষণ ও এর গুরুত্ব

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭ মার্চ সমাবেশে লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল নামে। বঙ্গবন্ধু নির্দিষ্ট সময়ে সমাবেশে উপস্থিত হয়ে দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন যা বিশ্বের ইতিহাসে খ্যাত হয়ে থাকবে। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল ৪টি। যথা–

ক) চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার,

খ) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া,

গ) গণহত্যার তদন্ত করা,

ঘ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু উপর্যুক্ত দাবির পাশাপাশি কতগুলো ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি পূর্ববাংলায় সকল অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। সেদিন জনসমাবেশের ওপর পাকিস্তান সরকারের কড়া নজর ছিল এজন্য যে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হবে। এবং এ আশঙ্কা থেকে বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে কোন ঘোষণা না দিয়ে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ব্যক্ত করে বলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এর সাথে তিনি মুক্তিসংগ্রামের জন্য সকলকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দেন এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানান।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ভাষণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর ভাষণ বাঙালি সৈন্য ও সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। বস্তুতপক্ষে এটি ছিল বাঙালি সৈন্যদের প্রতি একটি "গ্রীণ সিগন্যাল" স্বরূপ। তাছাড়া এ বক্তৃতায় বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। এদিন বঙ্গবন্ধু পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে দেশবাসীকে প্রস্তুত হতে আগাম নির্দেশ প্রদান করে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তাই ৭ মার্চের বক্তৃতা বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে মাইলফলক হিসেবে খ্যাত।

৪. অসহযোগ আন্দোলন-এর ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব: ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকে আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। আর ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরদিন থেকে দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। নেতার ঘোষণা অনুযায়ী দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকবাহিনী ও অফিসারদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। ইয়াহিয়া খান পরিস্থিতির পূর্বানুমান করতে পেরে ৭ মার্চ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠান। কিন্তু বাঙালির দুর্দম্য শক্তি ও মনোবলের নিকট টিক্কা খান ব্যর্থতার পরিচয় দিতে

থাকলেন। ১০ মার্চ সরকার এক সামরিক আদেশ জারি করে। এতে বলা হয় সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহে কোনো প্রকার বাধা প্রদান করা চলবে না এবং এতে কঠোর শাস্তির হুমকি প্রদান করা হয়। কিন্তু তাঁর এ হুমকি বাঙালিকে দমাতে পারে নি। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগ দেয়ার কঠোর নির্দেশ দিলেও অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৩ মার্চ রেডিও পাকিস্তান করাচি কেন্দ্রের খ্যাতনামা বাংলা খবর পাঠক সরকার কবিরউদ্দিন রেডিও পাকিস্তান বর্জন করেন। স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে বার্মা ইস্টার্ন, এসো, পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েলস, দাউদ পেট্রোলিয়ামকে সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্যে কোন প্রকার জ্বালানী ও তৈল সরবরাহ করতে নিষেধ করেন। ১৩ মার্চ সরকার পুনরায় সামরিক আইন জারি করে। ১৪ মার্চ ভুট্টো এক অবাস্তব প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার ফর্মুলা দেন। বঙ্গবন্ধু এসব কথায় কান না দিয়ে ১৪ মার্চ ৩৫ দফাভিত্তিক এক নির্দেশনামা জারি করেন। এতে বলা হয়–

ক. সকল সরকারি বিভাগসমূহ, সচিবালয়, হাইকোর্ট, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ পূর্বের মতোই বন্ধ থাকবে,

খ. বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে,

গ. জেলা প্রশাসক ও মহকুমা প্রশাসকগণ অফিস না খুলে আওয়ামী লীগ ও সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন,

ঘ. পুলিশ বিভাগও অনুরূপভাবে কাজ পরিচালনা করবেন,

ঙ. রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র চালু থাকবে। তবে গণআন্দোলনের খবর প্রচার না করলে কর্মীরা কাজে সহযোগিতা করবে না,

চ. কর-খাজনা দেয়া বন্ধ থাকবে,

ছ. তবে কোন কর আদায়যোগ্য বা আদায়কৃত থাকলে তা বাংলাদেশ সরকারের একাউন্টে জমা হবে।

বঙ্গবন্ধুর আদেশ জারির পর পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ মূলত অকেজো হয়ে যায়। কেবল সৈন্যবাহিনী ব্যতীত সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবস্থা উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া ১৫ মার্চ ঢাকা সফরে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবে রাজি হলেও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি। ১৬ মার্চ থেকে আলোচনা শুরু হয়। ২২ মার্চ হঠাৎ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। ইতোমধ্যে ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে নিরীহ মানুষের ওপর পাক সেনাদের হামলা ও হত্যা আলোচনাকে ব্যর্থ করে দেয়। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। আর এদিনই মধ্যরাতে বাঙালির ওপর নেমে আসে চরম আঘাত। ওই কালোরাতে পাক সেনারা বহু বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য অপরিসীম। এ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব। এ আন্দোলন পাকিস্তান শাসনের ভীতকে দুর্বল করে দেয়। বাঙালি প্রমাণ করল তাদের নিকট পাক সরকারের নির্দেশের কোন মূল্য নেই। অপরদিকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যে পূর্ববাংলায় কতটুকু গ্রহণযোগ্য তাই প্রমাণিত হলো। মূলত ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের সামরিক হস্তক্ষেপ পর্যন্ত পাকিস্তানি প্রশাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে এবং দেশ পরিচালিত হতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। তিনিই হয়ে ওঠেন সরকার প্রধান এবং তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবন পরিণত হয় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের অনুরূপ। ৭ মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু একদিকে পাকিস্তানের শোষণ, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি, কর্মসূচি, পাকিস্তানি

হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ এবং প্রয়োজনে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে তাদের মোকাবেলার নির্দেশ দেন। এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতার কথা এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যাতে ঘোষণার কিছু বাকি রইল না, অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ঘোষণা উত্থাপনের অভিযোগ গ্রহণও সহজ ছিল না। ফলে বাঙালি জাতি তাঁর এই বক্তৃতায় স্বাধীনতার বাণী পেয়ে স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে তুলতে থাকে মুক্তিবাহিনী যারা ২৫ মার্চের আক্রমণের পর পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। তাই ৭ মার্চের বক্তৃতা ও অসহযোগ আন্দোলন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে শিক্ষা দিয়েছে। বলতে গেলে অসহযোগ আন্দোলন থেকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'বজ্রকণ্ঠ' নামে প্রচারিত হয় যা বাঙালিকে স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনার পেছনে মূল দায়িত্ব পালন করেছে। নির্বাচনোত্তর ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি, প্রতারণা ও নির্বিচারে বাঙালি হত্যার প্রতিবাদে বাঙালি জাতি পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যে দুর্বার অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তা শেষপর্যন্ত সশস্ত্র স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে রূপ লাভ করে। আর পাকিস্তান সরকার শেষপর্যন্ত বাঙালির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯৬।
২। আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।
৩। মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২।
৪। মনসুর মুসা (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ইয়াহিয়া খান ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন ১৯৭১ সালের–
(ক) ১ জানুয়ারি (খ) ১ ফেব্রুয়ারি
(গ) ১ মার্চ (ঘ) ৭ মার্চ।

২। স্বাধীনতার ইশতেহার প্রথম ঘোষিত হয়–
(ক) আওয়ামী লীগের জনসভায় (খ) ছাত্র ইউনিয়নের জনসভায়
(গ) ৭ মার্চের ভাষণে (ঘ) ছাত্রলীগের জনসভায়।

৩। অসহযোগ আন্দোলনের চাপে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন–
(ক) ৭ মার্চ (খ) ২৫ মার্চ
(গ) ১ এপ্রিল (ঘ) ২৫ এপ্রিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে ১ মার্চে ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিন।

২। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক গুরুত্ব লিখুন।
৩। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তৃতার তাৎপর্য লিখুন।
৪। ১৯৭১ সালের ১–২৫ মার্চ পর্যন্ত বাঙালি জাতির অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপ্তি পর্যালোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। শেখ মুজিবের ৭ মার্চের বক্তৃতার গুরুত্ব বিশেষভাবে আলোচনাপূর্বক অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৫

২৫ মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–
২৫ মার্চে পাকিস্তানি বাহিনীর সংঘটিত গণহত্যার প্রস্তুতি জানতে পারবেন;
বাঙালি হত্যা পরিকল্পনা 'অপারেশন সার্চলাইট' সম্পর্কে অবগত হবেন;
২৫ মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকসেনা কর্তৃক নিরস্ত্র বাঙালিদের নির্বিচারে গণহত্যা বিশ্বের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সংযোজন করে। বিশ্বে স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনতাকে এরূপ হত্যার নজির খুব কমই দেখা যায়। পাকিস্তানের তৎকালীন শাসক মহলের নাগপাশ থেকে মুক্তির লক্ষে আন্দোলনরত বাঙালিদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা চিরদমিত করার লক্ষেই এ হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। কিন্তু অদম্য বাঙালি জাতি গণহত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং শুরু করে মুক্তির জন্য যুদ্ধ।

গণহত্যার প্রস্তুতি

পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যামূলক অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চ লাইট'। ২৫ মার্চ এ অপারেশন সংঘটিত হলেও মূলত এর প্রস্তুতি চলতে থাকে মার্চের প্রথম থেকে। বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১ মার্চের পূর্বে রংপুর সীমান্ত থেকে ট্যাংকগুলোকে ঢাকায় আনা শুরু হয়। ১ মার্চ হতে সেনা পরিবারের সদস্যদের পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিমে পাঠানো শুরু হয়। বেসামরিক পোষাকে সামরিক লোকজন পশ্চিম পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে শুরু করে। ৩ মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত অস্ত্র ও রসদ বোঝাই এম.ভি.

সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষা করতে থাকে। ৭ মার্চ টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠানো হয়। ৯ মার্চ সরকার সকল বিদেশীকে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগের নির্দেশ জারি করে। এ সময়ের মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি অফিসারদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং সৈন্যদের পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খানের ঢাকা আগমন এবং ২৪ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া প্রহসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মূলত এ সুযোগে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যাচাই ও সৈন্য সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ, একদিকে ১৬ মার্চ থেকে সমঝোতা বৈঠক শুরু হয়, অপরদিকে ১৭ মার্চ জেনারেল টিক্কা খান, লে. জে. খাদিম হোসেন ও রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত করেন। ১৯ মার্চ থেকে পূর্ববাংলায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয়ে যায়। একই দিন জয়দেবপুরে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে গেলে সংঘর্ষ বাঁধে। ২০ মার্চ সরকার জনগণকে নিরস্ত্রীকরণের লক্ষে অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ জারি করে এবং জেনারেল হামিদ ক্যান্টনমেন্ট হতে ক্যান্টনমেন্টে ঘুরাঘুরি শুরু করেন। ঐদিন জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল হামিদ খান, জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল ওমর, জেনারেল টিক্কা প্রমুখকে নিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক প্রস্তুতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। এ সময় প্রতিদিন ৬টি থেকে ১৭টি পর্যন্ত পি.আই.এ. ফ্লাইট, বোয়িং ৭০৭ বিমান সৈন্য ও রসদ নিয়ে ঢাকা আসতো এবং অসংখ্য জাহাজ সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষা করছিল। এ সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিসহ পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি করা হয়। ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এম.ভি.সোয়াত থেকে অস্ত্র ও রসদ খালাস শুরু হয়। ২৫ মার্চ গণহত্যার জন্য বেছে নেয়া হয়। ঢাকা শহরের মূল দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে। তাঁর নেতৃত্বে অপারেশনের নিম্নোক্ত পরিকল্পনা করা হয়–

১. পিলখানায় অবস্থিত ২২ নম্বর বালুচ রেজিমেন্ট বিদ্রোহী ৫ হাজার বাঙালি ই.পি.আর. সেনাকে নিরস্ত্র করবে এবং তাদের বেতার কেন্দ্র দখল করবে।

২. ৩২ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট রাজারবাগ পুলিশ লাইনে এক হাজার বাঙালি পুলিশকে নিরস্ত্র করবে।

৩. ১৮নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট নবাবপুর ও পুরনো ঢাকা শহরে হামলা চালাবে।

৪. ২২ নং বালুচ, ১৮ নং ও ৩২ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বাছাই করা একদল সৈন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল) ও জগন্নাথ হল এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াকত হল আক্রমণ করবে।

৫. বিশেষ সার্ভিস গ্রুপের এক প্লাটুন কমান্ডো সৈন্য শেখ মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করবে এবং তাঁকে জীবন্ত ধরে আনবে।

৬. ফিল্ড রেজিমেন্ট দ্বিতীয় রাজধানী এবং বিহারিদের এলাকা (মিরপুর-মোহাম্মদপুর) পাহারা দিবে।

৭. ভয় দেখানোর জন্য ট্যাংক বহরের একটি ছোট স্কোয়াড্রন তৈরি থাকবে। প্রয়োজন হলে তারা গোলাবর্ষণ করবে।

৮. উপর্যুক্ত সৈন্যরা রাস্তায় প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে তা ধ্বংস করে দেবে এবং তালিকাভুক্ত রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে হানা দেবে।

অপারেশন সার্চলাইট

মূল পরিকল্পনায় ছিল রাত ১.০০টা থেকে অপারেশন চালানো হবে। কিন্তু পথে বিলম্ব হবে ভেবে সৈন্যরা ১১.৩০ টার সময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ সময় প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ফার্মগেইট এলাকায় রাস্তায় মিছিলরত মুক্তিকামী বাঙালিরা। পাক সেনাদের গুলিতে মুহূর্তের মধ্যে তাদের কণ্ঠরোধ হয়ে যায়। একই সাথে আক্রমণ চালানো হয় পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। বাঙালি সৈন্যরা প্রথমাবস্থায় পাকসেনাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর পাকসেনাদের আধুনিক অস্ত্রের মুখে তারা হার মানতে বাধ্য হয়। এ সুযোগে পাকসেনারা সে রাতে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। উল্লেখ্য যে, অপারেশন ২৫ মার্চ শেষলগ্নে শুরু হলেও ঘড়ির সময় অনুযায়ী তা ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে গড়িয়ে যায়। রাত ১.৩০ টার সময় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে আক্রমণ শুরু হয় গভীর রাতে। প্রথমে তৎকালীন ইকবাল হলে (জহুরুল হক হল) আক্রমণ চালানো হয়। ছাত্ররা তাদের সাধারণ অস্ত্র নিয়ে প্রতিহত করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। সেদিন পাকসেনারা জহুরুল হক হলে রকেট দিয়ে হামলা চালায়। ফলে ছাত্রদের বই-খাতা, আসবাবপত্র সব আগুনে পুড়ে যায় এবং অনেকে নিহত হয়। এছাড়া পাকসেনারা কক্ষে ঢুকে গুলি করে অনেক ছাত্রকে হত্যা করে।

একইভাবে জগন্নাথ হলেও নারকীয় হত্যা চালানো হয়। শত শত ছাত্রের লাশ সেদিন জগন্নাথ হলের সিঁড়িতে, বারান্দায় ও রাস্তায় স্তুপ হয়ে পড়েছিল। শুধু ছাত্র নয়, হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত আবাসিক শিক্ষককেও হত্যা করা হয়েছিল। ছাত্রী হল রোকেয়া হলে চলেছিল নির্মম পাশবিক নির্যাতন। সেদিন পাকসেনাদের গুলিতে ও পাশবিক নির্যাতনে প্রাণ দিয়েছিল বহু তরুণী।

২৫ মার্চ রাতে একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরানো ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়ের বাজার, গণকটুলী, ধানমন্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে। এ আক্রমণে অংশ নিয়েছিলো পূর্ববাংলায় বসবাসকারী বিহারীরা। তারা পাকসেনাদের পথ দেখিয়েছিল এবং বাঙালিদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল। এদিন চট্টগ্রামে পাকসেনাদের গুলিতে ২০ জন নিহত হয়। একইভাবে দেশের অন্যান্য এলাকা যেখানে সেনানিবাস ছিল সেখানে গণহত্যা চালানো হয়।

২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন ইংরেজি দৈনিক 'দি পিপলস', বাংলা 'ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ' পত্রিকার অফিসে আগুন দেয়া হয়। এতে বহু পত্রিকাকর্মী আগুনে পুড়ে নিহত হয়।

২৫ মার্চের গণহত্যা সম্পর্কে যাতে পত্রিকায় সংবাদ প্রচার না করতে পারে সেজন্য দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের পূর্বেই বন্দি করে রাখা হয়েছিল এবং পরদিন বিদেশী সাংবাদিকদেরকে তাৎক্ষণিক দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। এর মধ্যেও কিছু সাংবাদিক তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁদের লেখনীতে স্থান দিয়েছিল। ২৫ মার্চ নিয়ে লেখা মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট পেইন-এর 'ম্যাসাকার', এন্থনি ম্যাসকারেনহাস-এর 'দি রেপ অব বাংলাদেশ' এবং পাকিস্তানি লেখক সিদ্দিক সালিক-এর 'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থ অন্যতম। এসব গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা যায় শুধু ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় ৭,০০০ জনের বেশি বাঙালি শহীদ হন। অপরদিকে পাকিস্তানি সরকারের পক্ষ থেকে 'পূর্ব পাকিস্তানের সংকট' সম্পর্কে প্রকাশিত শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয় ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ অবাঙালি নিহত হয়। এসব বিহারীদের রক্ষা সহ দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ২৫ মার্চ সামরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় বলে এতে উল্লেখ করা হয়।

২৫ মার্চ গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

কারো কারো মতে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ঘোষণা বাণী ওয়্যারলেসযোগে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাবাণী শোনামাত্রই চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। শুরু হয় পাকসেনাদের সাথে বাঙালি পুলিশ, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই যা বাংলাদেশের ইতিহাসে 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে আখ্যায়িত। এ মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বের কয়েকটি ঘটনা জানা যায় পরবর্তীকালে। যেমন- মেজর খালেদ মোশাররফ কুমিল্লা ও সিলেট সেক্টরে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ২৬ মার্চ ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রাকারী পাকসেনাদের সাথে কুমিল্লায় প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। একইভাবে জয়দেবপুরের উদ্দেশে অগ্রসরমান পাকসেনাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেন মেজর শফিউল্লাহ এবং পরবর্তীকালে তিনি টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেন। মেজর জলিল বরিশালের নিয়ন্ত্রণ দখল করেন। একইভাবে ঐদিন নওগাঁও মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষিত হয়। উইং কমান্ডার নাজমুল হক এবং ক্যাপ্টেন গিয়াস ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে বগুড়া এবং রাজশাহীতে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ২৬ মার্চ পুলিশ বাহিনী ও জনগণ পাবনায় পাকবাহিনীর হামলা প্রতিহত করে এবং ২৭ মার্চ এ জেলাকে মুক্ত এলাকা ঘোষণা করে। চাঁপাই নবাবগঞ্জের ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সদস্যরা পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্প দখল করে নেয়। এভাবে প্রায় প্রতিটি জেলা শহর এবং অনেক পল্লী এলাকায় বাঙালি সেনাবাহিনী সদস্য, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ, আনসার এবং মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সাহসিকতার সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করে। এরপর ১০ এপ্রিল গঠিত হয় অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার। এ সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ একটি সাংগঠনিক ও নিয়মতান্ত্রিক রূপ লাভ করে এবং চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষে অগ্রসর হয়।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের নির্মম গণহত্যা মানব ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় সূচিত করেছে। বিশ্বের ইতিহাসে এমন মানবতা বিরোধী ঘটনা বিরল। পশ্চিম পাকিস্তানি নর-পিশাচরা বাঙালি জাতিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষে এ বর্বরোচিত ঘটনার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতি তাতে পিছপা না হয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্খায় মত্ত হয়ে অগ্রসর হয় এবং শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। মনসুর মুসা, *বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪)।
২। মাহফুজুর রহমান, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। পাকিস্ড়নি হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চ গণহত্যা পরিকল্পনার নাম দিয়েছিল–

(ক) অপারেশন জ্যাকপট (খ) অপারেশন সার্চলাইট

(গ) ঢাকা অপারেশন (ঘ) সেনা অপারেশন।

২। অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনার প্রবক্তা ছিলেন–

(ক) রাও ফরমান আলী (খ) টিক্কা খান

(গ) জেনারেল হামিদ (ঘ) ইয়াহিয়া খান।

৩। ২৫ মার্চ প্রথম পাকসেনাদের নির্মম গণহত্যার শিকার হয়–

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ) ফার্মগেইটে মিছিলরত বাঙালিরা

(গ) পিলখানার ইপিআর (ঘ) পুরান ঢাকা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

২। ২৫ মার্চ গণহত্যার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার পরিকল্পনা 'অপারেশ সার্চলাইট'-এর বর্ণনা দিন। ২৫ মার্চের গণহত্যা কিভাবে মুক্তিযুদ্ধকে তরান্বিত করে?

পাঠ-৬

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *স্বাধীনতা ঘোষণার দলিল সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন;*
- *স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতিক্রিয়া ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।*

পৃথিবীর দু'টি দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল এদেশের মুক্তিসংগ্রামের মাইলফলক ও প্রেরণার উৎস। বিভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারিত হলেও এর বিষয়বস্তু ও নির্দেশনা ছিল একই এবং এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এসব ঘোষণার ফলে বাঙালিদের পক্ষে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয় এবং তার ইপ্সিত বিজয় অর্জন সহজ হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের এক দশকের মাথায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সামরিক সরকারের হাতে চলে যায়। সামরিক সরকার দেশ পরিচালনার নামে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শোষণ ও নির্যাতন শুরু করলে ১৯৬০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হতে থাকে। ১৯৬৯ সালে স্বায়ত্তশাসনের প্রবল দাবির মুখে জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে নির্বাচন ঘোষণা করেন এবং জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। কিন্তু ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে না দিয়ে গড়িমসি শুরু করেন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসার কথা থাকলেও পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতা লিপ্তাসার কারণে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন এবং তাঁর এরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত ঘোষণা বাঙালি জাতিকে স্বায়ত্তশাসনের দাবির পরিবর্তে স্বাধীনতার দাবির দিকে ধাবিত করে। ১ মার্চ কয়েকজন ছাত্র নেতার উদ্যোগে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় এবং ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন ও ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন এবং ছাত্রনেতারা বাংলাদেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষে কতগুলো পরিকল্পনাও ঘোষণা করে। ৩ মার্চের পর

পুলিশী নির্যাতন ও ছাত্র-জনতা হত্যা এবং সরকারের গভীর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যোন) এক জনসভার আহ্বান করা হয়। সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা ছিল ঐ দিন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিবেন। অপরদিকে পাকিস্তান সরকারও ঐদিনটির প্রতি কড়া নজর রাখে এবং স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারিত হলে কড়া এ্যাকশন নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। বঙ্গবন্ধু যথাসময়ে জনসভায় উপস্থিত হন এবং বাঙালি জাতির পরবর্তী দিকনির্দেশনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি পরোক্ষ ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর এ ঘোষণা বাঙালি জাতি তথা স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে মাইলফলক হিসেবে ভূমিকা রেখেছিল। জনসভায় তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল চারটি– (১) চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার, (২) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, (৩) গণহত্যার তদন্ত করা ও (৪) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

উপরোক্ত দাবিগুলোর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের উদ্দেশে কতগুলো নির্দেশ জারি করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ও বেসরকারি অফিস, কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন এবং সরকারকে কর বা খাজনা দিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রচার মাধ্যমগুলোতে আওয়ামী লীগের সংবাদ প্রচার না করা হলে সেগুলো বন্ধ করতে নির্দেশ জারি করেন। তিনি জনগণের স্বার্থের প্রতিকূলে ব্যবহৃত বন্দর ও যানবাহন চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেন। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ২৮ মার্চের মধ্যে বেতন তুলে আনতে নির্দেশ দেন। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরোক্ষ ঘোষণা দেন। তাঁর কণ্ঠে "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এর সাথে বঙ্গবন্ধু মুক্তিসংগ্রামের জন্য সকলকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যায় যে, তিনি স্পষ্টভাবে ঐদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোষণা দিয়েছেন। এদিন বিকেলে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ও বাঙালি সেনা কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি সকলকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন। অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন এর মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কূটনীতিবিদগণের মতে, ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূনর্বার ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। কারণ এতে তিনি স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার সবুজ সংকেত দিয়েছেন। এ ঘোষণার পর থেকে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শুরু হয়ে যায়। অপরদিকে সরকারও পরিস্থিতি শক্ত হাতে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।

'৭১-এর মার্চের এ উত্তাল ও উত্তেজনা মুহূর্তে ইয়াহিয়া খান অগত্যা বঙ্গবন্ধুর সাথে রাজনৈতিক সমঝোতার লক্ষে আলোচনার প্রস্তাব দেন এবং ১৬ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত এক ব্যর্থ আলোচনা চালিয়ে যান। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও রসদ আমদানি করতে থাকেন। ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ রাতে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খান ও পাকবাহিনীকে নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালিদের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যান। ফলে ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক গণহত্যা চালানো হয়। ঐদিন রাত দেড়টায় বঙ্গবন্ধুকে বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ২৫ মার্চ দিনের বেলা বঙ্গবন্ধু ঘটনা উপলব্ধি করে যে কোন জরুরি ঘোষণা প্রচারের লক্ষে বুয়েট থেকে কয়েকজন

প্রকৌশলী নিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নং বাসভবনে একটি ট্রান্সমিটার স্থাপন করেন বলে কোন কোন সূত্রে উল্লেখ আছে। বন্দি হওয়ার পূর্বে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইংরেজি ভাষায় ঘোষণা করেন এবং এ ঘোষণা অনুযায়ী ওয়ারলেসযোগে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। শোনা যায়, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরণকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরীর নিকট পৌঁছে। ঐদিন বিবিসি-র প্রভাতি অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। এদিকে দেশের সকল রেডিও স্টেশন ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুল হান্নান সহ কতিপয় নেতার উদ্যোগ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে যন্ত্রপাতি স্থানান্তরিত করে চট্টগ্রামে কালুরঘাট প্রেরণ কেন্দ্রটিকে বেতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন এবং এর নাম দেন "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র"। কারো কারো মতে এ কেন্দ্র থেকে ২৬ মার্চ বেলা ২-১০টায় চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন এবং একই কেন্দ্র থেকে ২৭ মার্চ মেজর (পরে রাষ্ট্রপতি) জিয়াউর রহমান প্রথম নিজ নামে এবং পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এরপর ৩০ মার্চ পর্যন্ত জিয়াউর রহমান বহুবার ঘোষণাটি প্রচার করেন। ১০ এপ্রিল মুজিব নগরে অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে এ সরকারের পক্ষ থেকে সাংবিধানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়। তবে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা হিসেবে ধরে নিয়ে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণার দলিলপত্র

১) ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিলপত্র ও তথ্য সংকলিত আছে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র" শীর্ষক ১৫ খন্ডে রচিত গ্রন্থে। এ গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ১ম পৃষ্ঠায় ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীটি সন্নিবেশিত রয়েছে। মূল ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে। এর বাংলা অর্থ নিম্নরূপ-

"এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসীকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।" দলিলপত্রে আরো বলা হয়, ২৫ মার্চ মধ্যরাত ও ২৬ মার্চ ইপিআর ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে এই বাণীটিই দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে।

২) ২৬ মার্চ, এম. এ. হান্নান-এর ঘোষণা: মো: আবদুল হান্নান ২৬ মার্চ দুপুরে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে যে ঘোষণা দেন তা ছিল নিম্নরূপ–

"আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ও তাঁর নামে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আপনারা যারা এ গোপন রেডিও হতে আমার এই ঘোষণা শুনছেন তারা অন্যদের নিকট এই বাণী প্রচার করবেন। আর যার নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোবাকেলা করুন এবং দেশকে মুক্ত করুন।"

৩) ২৭ মার্চ, মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণা: ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা যে ঘোষণাটি প্রচার করেন তা ঐদিন ভারতের 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র" শীর্ষক গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ২য় পৃষ্ঠায় এ ঘোষণাটি লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে যার বাংলা অর্থ নিম্নরূপ–

"আমি মেজর জিয়া, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর অস্থায়ী প্রধান সেনাপতি, শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।

আমি ঘোষণা করছি, আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে সার্বভৌম বৈধ সরকার গঠন করছি। আমরা অঙ্গীকার করছি যে, এই সরকার আইন ও সংবিধান মতে দেশ চালাবে। এই নতুন গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ থাকবে। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে এই সরকার বন্ধুত্ব কামনা করে এবং বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করে যাবে। আমি সকল সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি তারা যেন বাংলাদেশের বর্বর গণহত্যার বিরুদ্ধে তাদের জনমত গড়ে তোলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে বাংলাদেশ সরকার সার্বভৌম ও বৈধ। এই সরকার বিশ্বের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রত্যাশা করে।"

৪) ১০ এপ্রিল, স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা: ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র" শীর্ষক গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ৪র্থ পৃষ্ঠায় উক্ত ঘোষণা ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ আছে যার ঘোষণা সংক্রান্ত অংশের বাংলা নিম্নরূপ–

"এবং

যেহেতু উল্লেখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখন্ডতা রক্ষার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রম দ্বারা বাংলাদেশের ওপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন, আমরা সেই বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা একটি গণপরিষদে গঠিত হয়ে পারস্পরিক আলোচনা করে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার, বলবৎ রাখবার জন্য বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতা ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।"

প্রতিক্রিয়া ও গুরুত্ব

১৯৭১ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার ঘোষণা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে দারূণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা দিবস হিসেবে স্বীকৃত হলেও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ তারিখের ঘোষণার পরপরই দেশে বাঙালি ও সরকার উভয় পক্ষে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঐদিন থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ৭ মার্চ বিকালবেলা ছাত্র-ছাত্রীরা রাইফেল নিয়ে ঢাকা রাজপথে মার্চ শুরু করে। ৮ মার্চ দেশে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যায় এবং ২৫ মার্চ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ.ও.টি.সি-র ক্যাডেটরা এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে (ঢাকায়)। একইভাবে বাঙালি সৈন্যদের মধ্যেও আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, '৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক 'গ্রীণ সিগন্যাল' বলে মনে হলো"। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণার পর থেকে পূর্ববাংলায় অসহযোগ ও প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।

অপরদিকে পাকিস্তান সরকার ৭ মার্চ তারিখেই জেনারেল টিক্কা খানের মতো নরপিশাচকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। শুরু হয় বাঙালির ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ডাকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেশের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল।

২৫ মার্চ দিবাগত রাতের পর দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো পাকসেনাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তবুও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, সিলেট, শেরপুর, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রতিরোধ ব্যুহ গড়ে তোলা হয়েছিল। তাঁর ঘোষণা পেয়ে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কালুরঘাট বেতার ট্রান্সমিটার কেন্দ্রকে নিরাপদ মনে করে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র" হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং নিয়মিত স্বাধীনতার পক্ষে অনুষ্ঠান ও বুলেটিন প্রচার করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ২৬ মার্চ দুপুর বেলা চট্টগ্রাম থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ. হান্নান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি পুন:প্রচার করেন এবং ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। এরপর থেকে মুক্তিযুদ্ধ একটি প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করে।

এই প্রতিটি ঘোষণাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। তবে মুজিবনগর ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, একটি সরকার এ ঘোষণা দিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ এ সরকারের কর্তৃত্বেই পরিচালিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটসহ শেখ মুজিবুর রহমানের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে। একই তারিখ থেকে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আইন বলবৎকরণ আদেশ জারি করেন। নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানের এই ঘোষণাটি পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর ঘোষণাকে তাঁর নির্দেশ হিসেবে গণ্য করে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয়।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালে প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে হান্নান, মেজর জিয়া ও স্থানীয় পর্যায়ে কিছু ঘোষণার মূল ভিত্তি ছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীনতার পর সংবিধানে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ঘোষণার মাধ্যমেই এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করেছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, ৩য় খন্ড, ঢাকা, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৮২।

২। আনোয়ারুল ইসলাম, *স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু*, ময়মনসিংহ, রওশন আরা চৌধুরী, ১৯৯২।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বঙ্গবন্ধুর লেখা স্বাধীনতা ঘোষণাটি প্রথম যে বেতার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারিত হয় সেটার নাম–

(ক) চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র (খ) রেডিও পাকিস্তান

(গ) স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (ঘ) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

২। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে ২৬ মার্চ দুপুরে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণাটি পাঠ করেন–

(ক) মেজর জিয়া (খ) জহুর আহমেদ চৌধুরী

(গ) এম.এ. হান্নান (ঘ) বেলাল মোহাম্মদ।

৩। মুজিবনগর থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয় ১৯৭১ সালের–

(ক) ২৬ মার্চ (খ) ৪ এপ্রিল

(গ) ১০ এপ্রিল (ঘ) ১৭ এপ্রিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষাপট রচনায় ৭–২৫ মার্চের ঘটনাবলীর গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

২। বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ এবং পরবর্তীতে মোহাম্মদ হান্নান ও মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

৩। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতা ঘোষণার গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বিভিন্ন দলিলগুলো পর্যালোচনা করুন। স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতিক্রিয়া ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরমালাঃ

পাঠ-১ঃ ১। (গ); ২. (খ); ৩. (ক); ৪. (গ); ৫. (ঘ)।

পাঠ-২ঃ ১। (ক); ২. (গ); ৩. (গ); ৪. (গ); ৫. (ঘ)।

পাঠ-৩ঃ ১। (খ); ২. (ক); ৩. (ঘ); ৪. (গ); ৫. (খ); ৬. (গ); ৭. (ক); ৮. (গ)।

পাঠ-৪ঃ ১। (গ); ২. (ঘ); ৩. (খ)।

পাঠ-৫ঃ ১। (খ); ২. (ক)।

পাঠ-৬ঃ ১। (গ); ২. (গ); ৩. (গ)।